মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

রাসূলুল্লাহ্‌র বিপ্লবী দাওয়াত

রাসূলুল্লাহ (স)-এর

বিপ্লবী দাওয়াত

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

খায়রুন প্রকাশনী
বিক্রয় কেন্দ্র : বুক্স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা),
দোকান নং - ২০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০
ফোন : ৭১১৫৯৮২, ৮৩৫৪১৯৬, ০১৭১৫-১৯১৪৭৭, ০১৭১৩-০৩৪২৩০

রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিপ্লবী দাওয়াত
মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম ঃ ১৯৮৬ ইং
৬ষ্ঠ প্রকাশ ঃ
জানুয়ারী ২০১২ ইংরেজী
মহররম ১৪৩৩ হিজরী
মাঘ ঃ ১৪১৮ বাংলা

প্রকাশক ঃ
মোস্তাফা নাসিরুল হক
খায়রুন প্রকাশনী

প্রচ্ছদ ঃ
মাল্টি লিংক

শব্দ বিন্যাস ঃ
মোস্তাফা কম্পিউটার্স
ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ ঃ
আফতাব আর্ট প্রেস, ২/১ তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা

মূল্য : ৯০.০০ টাকা মাত্র।

ISBN : 984-8455-53-14
RASULULLAH (S)-ER BIPLLOBI DAWAT : The Revolutionary call of the Holy Prophet of Allah. Written by Maulana Muhammad Abdur Rahim and published by Mustafa Nasirul Haque of Khairun Prokashani.

January, 2012

Price : Tk. 90.00
Dollar (U.S) : 2.00

প্রসঙ্গ কথা

মানব জাতির কল্যাণ প্রয়াসে যুগে-যুগে দেশে-দেশে অনেক মহৎপ্রাণ ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁদের কেউ কেউ মানব সমাজে উন্নত নৈতিক আদর্শের প্রচার করেছেন; আবার কেউ কেউ মানব জাতিকে গভীর তত্ত্বপূর্ণ সমাজ-দর্শন উপহার দিয়েছেন। তাঁদের প্রচারিত আদর্শ ও দর্শন মানব জীবনে কিছু কিছু মহৎ প্রেরণা সৃষ্টি করলেও তা সামগ্রিক জীবনে কোন কল্যাণময় পরিবর্তন আনতে পারেনি। কিন্তু বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স) মানব জাতির কল্যাণে যে অবদান রেখেছেন, গোটা মানবেতিহাসে তার দ্বিতীয় কোন নজীর খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঈসায়ী ছয় শতকে আরব উপদ্বীপের একটি নিরক্ষর, বেদুঈন ও কলহপ্রিয় জনগোষ্ঠীর মাঝে আবির্ভূত হয়েও তিনি বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছেন এক মহত্তম জীবন আদর্শ এবং মাত্র তেইশ বছরে সে আদর্শের প্রতিটি হরফ বাস্তবায়িত করে দুনিয়ার সামনে রেখে গেছেন চিরকালের জন্যে এক অম্লান দৃষ্টান্ত।

দুর্ভাগ্যবশত আজকের মুসলমানরা বিশ্বনবীর এই অনন্য খেদমতের কথা বিস্মৃত হয়ে তাঁকে শুধু একজন ধর্মগুরুর আসনে বসিয়ে রেখেছে। মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছিলেন, সে কথা ভুলে গিয়ে আজকের মুসলমানরা শুধু তাঁর স্মরণে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করেই দায় সারছে। এর ফলে বিশ্বনবীর জীবন আদর্শ আজকের মুসলমানদের জীবনে কোন বৈপ্লবিক প্রেরণা সৃষ্টি করছে না; নিজেদের সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশ্বনবীর কল্যাণময় আদর্শ কায়েমের কোন তাগিদও তারা পাচ্ছে না।

মহান ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক হযরত আল্লামা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) মুসলমানদের এই সাধারণ বিভ্রান্তির প্রেক্ষিতেই বিশ্বনবীর মহান শিক্ষা ও জীবন আদর্শ উপস্থাপন করেছেন তাঁর এই মূল্যবান গ্রন্থে। এতে গতানুগতিক নিয়মে তিনি বিশ্বনবীর কোন ধারাবাহিক জীবন কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন নি; বরং মানব জাতির সার্বিক কল্যাণে তিনি যে বৈপ্লবিক কর্মনীতি ও কর্মধারা অবলম্বন করেছিলেন, গ্রন্থকার তা-ই এতে তুলে ধরেছেন অত্যন্ত সহজ প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায়। এই গ্রন্থের বিভিন্ন নিবন্ধে বিশ্বনবীর জীবনে সংঘটিত কয়েকটি টুকরা ঘটনার কথা বারবার উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু ঘটনাগুলোর বিশ্লেষণে প্রতিটি ক্ষেত্রেই গ্রন্থকার যে নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন, এক কথায় তা অনন্য—অনবদ্য।

বাংলা ভাষাভাষী পাঠক-পাঠিকা, বিশেষত ইসলামী আন্দোলনের কর্মীবৃন্দ এ গ্রন্থটিতে পাবেন চিন্তা ও প্রেরণার এক অফুরন্ত উৎস। আমরা গ্রন্থকারের প্রথম স্মৃতি বার্ষিকীতে এটি পাঠকদের হাতে তুলে দিয়েছিলাম গভীর আগ্রহের সাথে। মাত্র অত্যল্পকালের মধ্যেই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় আমরা আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ শোকর আদায় করছি। আমরা এই সংস্করণেও প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ভুলত্রুটি সংশোধনের ব্যাপারে যথাসাধ্য যত্ন নিয়েছি । পরিশেষে গ্রন্থকারের এই দ্বীনী খেদমত কবুল করার জন্য আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল' আলামীনের কাছে সানুনয় আবেদন জানাচ্ছি।

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
চেয়ারম্যান
মওলানা আবদুর রহীম ফাউন্ডেশন

সূচী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিশ্বনবী (স)-র জীবনী অধ্যয়ন

আমরা দুনিয়ার মুসলমানরা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মত। সেজন্য আমরা প্রায় সকলেই বিশ্বনবী(স)-র জীবনী অধ্যয়ন বা শ্রবণ করি। আমাদের ওয়ায়েজ ও আলিমগণ প্রায় সব সময়ই রাসূলে করীম (স)-এর জীবনী আলোচনা ও পর্যালোচনা করেন; নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে তাঁর জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনাবলীর উল্লেখও করে থাকেন। এর ফলে সাধারণ মুসলমানরা রাসূল (স)-এর জীবন-কাহিনী মোটামুটি জানেন বললেও অত্যুক্তি হবে না।

কিন্তু আমার মনে হয়, নবী করীম (স)-এর জীবনকে মুসলমানদের জীবন চেতনায় যেরূপ গুরুত্ব দেয়া উচিত ছিল সেরূপ আদপেই দেয়া হয়নি। এ কারণেই নবী করীম (স)-এর গোটা জীবনী থেকে যে আদর্শ, শিক্ষা ও প্রেরণা লাভ আমাদের জন্য একান্তই জরুরী ছিল তা থেকে আমরা সাধারণ মুসলমানরা অনেকটা বঞ্চিতই হয়ে আছি।

আমাদের ওয়ায়েজ ও আলিম সাহেবান সাধারণত নবী জীবনের ঘটনাবলী বিক্ষিপ্ত ও খণ্ডিতভাবেই উল্লেখ করেন জনগণকে নসীহত করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তাতে তাঁর জীবনাদর্শের সঙ্গে সামগ্রিকভাবে আমাদের পরিচয় ঘটে না। আমরা তা থেকে অনুসরণীয় আদর্শের এবং সে আদর্শ নিজেদের জীবনে অনুসরণ করে চলার প্রেরণা লাভ করতে সক্ষম হই না। আমাদের পাঠ্যপুস্তকে হয় রাসূল (স)-এর জীবনী আদপেই সংযোজিত হয় না নতুবা কোন ক্ষেত্রে তা হয়ে থাকলেও তা থেকে শিক্ষার্থীরা তাঁকে অনুসরণ করে চলার প্রেরণা লাভ থেকে বঞ্চিতই থেকে যায়। তার ফলেই আমাদের ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনে নবী জীবনের আদর্শের কোন প্রতিফলন ঘটছে না। আমরা হয়তো ঘটনাবলীর পাঠ বা বিবরণ শ্রবণ করি; কিন্তু সেই ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত গভীরে যে শিক্ষণীয় তত্ত্ব নিহিত রয়েছে, তা আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটন করা হয় না। ফলে সে বিবরণ একটা তাৎপর্যহীন কাহিনী মাত্র হয়ে থাকে; অনুসরণ বা অনুকরণের প্রেরণা-উৎস হয়ে দাঁড়ায় না।

কিন্তু বিশ্বনবী (স)-র জীবন কাহিনী পাঠ বা শ্রবণের লক্ষ্য শুধুমাত্র ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিতি লাভই হওয়া উচিত নয়। শুধু কিস্‌সা বা কাহিনী জানাই আমাদের জন্য কিছুমাত্র কল্যাণকর হতে পারে না। সেরূপ অবস্থায় এই জানাটা মানবেতিহাসের আরও হাজারো ব্যক্তির—রাজা-বাদশাহ, সেনাধ্যক্ষ ও দেশ-বিজয়ীর—ঐতিহাসিক কাহিনী জানার মতই হয়ে দাঁড়ায়। স্পষ্টত মনে হয়, তা সুদর

অতীতকালে জীবিত থাকা এক ব্যক্তির জীবন-কাহিনী, আজকের মানুষের জীবনের সঙ্গে যার বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। তাতে আজকের দিনের প্রেক্ষিতে শিক্ষণীয় বা অনুসরণীয়ও কিছু নেই। তা যেন শোনা বা পড়ার বিষয় মাত্র। আমাদের এখনকার বাস্তব জীবনে তার কোন প্রতিফলন ঘটার যেন আদৌ প্রয়োজন নেই। সে জীবনীর তেমন কোন দাবিও যেন নেই আমাদের প্রতি। বস্তুত নবী-জীবনীর প্রতি আমাদের সাধারণ আচরণ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার আদপেই তা নয়। আমরা যে ইসলামের প্রতি ঈমানদার, বিশ্বনবী (স)-র জীবনী সেই ইসলামেরই বাস্তব প্রতীক। যে কোন ব্যক্তিই তাঁর জীবনচিত্রে ইসলামের বাস্তব প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবে। আদর্শ হিসেবে ইসলাম যা, বাস্তবতার নিরিখে রাসূলে করীম (স)-এর জীবনী ঠিক তা-ই। ইসলামী আদর্শের বাস্তব রূপ দেখতে হলে রাসূল (স)-এর জীবনখানি সম্মুখে প্রোজ্জ্বল করে রাখতে হবে। অন্যথায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনী অধ্যয়ন বা শ্রবণ অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে। বস্তুত তাঁর জীবন-দর্শনে ইসলামী আদর্শের বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে ঠিক তেমনি, যেমন স্বচ্ছ দর্পনে যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয় প্রত্যেক আয়না-দর্শকের মুখাবয়ব। উপরন্তু মুসলিম হিসেবে আমাদের জীবনের মূল্যায়ন বা যাচাই করতে হলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মহান জীবনীকে একখানি স্বচ্ছ দর্পণই গণ্য করতে হবে এবং তার মাহাত্ম্য তুলনা করে নিজেদের ভুল-ত্রুটি, অভাব, অসম্পূর্ণতা, বিচ্যুতি, বিকৃতি ও পদস্খলন চিহ্নিত করতে হবে। সেই সাথে নবী-জীবনে যে পূর্ণতা-বিশালতা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আদর্শিক বলিষ্ঠতা, নৈতিক দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা প্রতিভাত, তা অক্ষরে অক্ষরে অনুধাবন করে নবী-জীবনী অধ্যয়নকে সার্থক এবং বাস্তব জীবনে তা অনুসরণ করে চলার সুদৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। তাহলেই রাসূল (স)-এর প্রকৃত অনুসারী হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে।

উপরন্তু রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনী থেকে প্রেরণা বা শিক্ষালাভের জন্য তাঁর সমগ্র জীবনকে সামগ্রিকভাবেই সম্মুখে রাখতে হবে। খণ্ড জীবন কাহিনী খণ্ডিত শিক্ষা উপস্থাপন করে বটে, কিন্তু আমাদের জন্য আসলে প্রয়োজন অখণ্ড জীবনাদর্শ। টুকরো বিচ্ছিন্ন ঘটনার উল্লেখ অনেক সময় আমাদের সম্মুখে এমন দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে, যা তাঁর সামগ্রিক জীবনের সঙ্গে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এর ফলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনীকে অবমাননা ও অবমূল্যায়নের মত সাংঘাতিক দুর্ঘটনাও ঘটে যেতে পারে।

অথচ তিনি ছিলেন একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ—ইনসান-ই-কামিল—পূর্ণাঙ্গ ইসলামের নিখুঁত ও বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তাই তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবন অধ্যয়ন বা উল্লেখ একান্তই আবশ্যক। দ্বীন-ইসলাম আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান। হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে অসংখ্য নবী-রাসূল এসেছেন এই দ্বীন-ইসলাম প্রচারেরই দায়িত্ব

নিয়ে। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সময়ের জনগণের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ ছিলেন, এ কথায় সন্দেহ নেই। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (স) সর্বশেষ নবী—খাতামুন্নাবীয়্যীন। তাঁর জীবনেই ইসলাম পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ জীবন বিধানে পরিণত হয়েছে; ইসলাম তাই চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। অতএব পূর্ণাঙ্গ ইসলামের বাস্তব প্রতিফলন এবং চূড়ান্ত ইসলামের সর্বশেষ প্রতিচ্ছবি দেখার লক্ষ্য উজ্জ্বল হয়ে থাকা আবশ্যক তাঁর জীবনী অধ্যয়নকালে।

এ লক্ষ্যটির বিশ্লেষণ করার জন্য একে নিম্নোদ্ধৃত কতিপয় ধারায় বিভক্ত করা যায় ঃ

ক) রাসূলে করীম (স)-এর ব্যক্তিত্ব, তাঁর জীবনকালের ঘটনাবলী এবং তিনি যে পরিবেশে জীবন যাপন করেছেন, সেই পরিবেশ ও পরিস্থিতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও অনুধাবন। এ কথা সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, তিনি তাঁর জাতির লোকদের মধ্যে জন্মগ্রহণকারী এক অনন্যসাধারণ 'ব্যক্তিত্ব'ই শুধু ছিলেন না, তারও পূর্বে তিনি ছিলেন মহান আল্লাহ্র নিজ ইচ্ছায় মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল। আল্লাহ্ তা'আলা ওহী নাযিল করে তাঁকে পথ দেখিয়েছেন। তিনি সর্বাবস্থায়ই মহান আল্লাহ্র অসীম-অফুরন্ত সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করেছেন। তিনি প্রতি মুহূর্তে ছিলেন আল্লাহ্র সংরক্ষণের আওতাধীন।

খ) তাঁর জীবনীতে প্রত্যেক ব্যক্তিই জীবনের সর্বদিক ও সকল বিভাগের জন্য উন্নত জীবনের আদর্শকে উচ্চতর বাস্তব দৃষ্টান্তরূপে সুস্পষ্ট ও ভাস্বর দেখতে পারে। তা থেকে সে একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান লাভ করতে পারে। তা গ্রহণ করা ও সে অনুযায়ী স্বীয় জীবন পরিচালিত করে তাকে উন্নত, ধন্য ও আলোকমণ্ডিত করে তুলতে পারে। বস্তুত মানব জীবনের যে কোন দিকে ও যে কোন বিভাগেই উন্নততর আদর্শের সন্ধান করা যাবে, সেই দিকে ও সেই বিভাগেই রাসূল জীবনীকে পূর্ণাঙ্গ ও চিরভাস্বর দেখতে পাওয়া যাবে। তা এতই পূর্ণাঙ্গ যে, তার চাইতে অধিক পূর্ণাঙ্গ কিছু মানুষের কল্পনারও ঊর্ধ্বে এবং তা এতই ভাস্বর যে, তার চাইতে উজ্জ্বলতর জীবন অকল্পনীয়। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মহান ও পবিত্র জীবনকে সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য চিরকালের একমাত্র উন্নততর ও নির্মলতর আদর্শ বলে ঘোষণা করে বলেছেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ -

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র রাসূলেই রয়েছে তোমাদের জন্য অতীব উত্তম আদর্শ।

গ) রাসূল (স)-এর জীবনী অধ্যয়নের ফলে কুরআনের তত্ত্ব অনুধাবন অত্যন্ত সহজসাধ্য হবে। রাসূল (স)-এর জীবনী ব্যক্তির সম্মুখে যতটা উজ্জ্বল এবং যতটা ভাস্বর থাকবে, কুরআনী ভাষার অন্তরালে নিহিত গভীর ও সুমহান ভাবধারা আয়ত্ত করা এবং তার লক্ষ্যসমূহ অর্জন করা তার পক্ষে ততই সহজ হবে। কেননা কুরআনের বহু আয়াতই রাসূল জীবনে সংঘটিত বহুতর ঘটনার ব্যাখ্যা দান করে; তাতে রাসূল (স)-এর অনুসৃত নীতির নির্দেশ রয়েছে সুস্পষ্টভাবে।

ঘ) রাসূল (স)-এর জীবনী অধ্যয়নের মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামী সংস্কৃতি ও মূল্যমানের (Values) অভ্রান্ত সন্ধান লাভ সম্ভব। তা যেমন আকীদা-বিশ্বাস পর্যায়ের, তেমনি আইন-বিধান ও নৈতিকতা পর্যায়েরও হতে পারে। কেননা, তাঁর মহত্তম জীবন ইসলামের মৌল নীতি ও আদর্শের বাস্তব প্রতীক—তাতে সামষ্টিক জীবনও সমভাবে প্রতিভাত।

ঙ) রাসূলে করীম (স)-এর জীবনী পাঠ করতে হবে এমনভাবে, যেন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের যথার্থ ও নির্ভুল পদ্ধতিসমূহ ইসলামী আদর্শের প্রচারক ও ইসলামী দাওয়াত (আন্দোলন)-এর ঝাণ্ডাবাহীদের আয়ত্তাধীন হয়ে যায়। কেননা, একথা সর্বজনবিদিত যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দ্বীন-ইসলামের এক মহান প্রচারক ও শিক্ষাদাতা রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। উপরন্তু তিনি শুধু ইসলামের শিক্ষক বা প্রচারকই ছিলেন না, তার (ইসলামের) বাস্তব প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন। সমসাময়িক সমস্ত প্রকারের ধর্মমত ও মতাদর্শকে বাতিল প্রমাণ করে এবং সে সবকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে তিনি ইসলামকে এক বিজয়ী আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিতও করেছিলেন। এ জন্য শুরু থেকেই তাঁকে বাতিলপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছিল। তাঁর জীবনের মক্কী পর্যায়ে—নবুয়্যাতের প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠিত ও পরাক্রমশালী বাতিলপন্থীদের প্রাত্যহিক অত্যাচার-নির্যাতন তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে। তাদের সৃষ্ট প্রতিকূল আচার-আচরণের প্রবল স্রোত তাঁকে সম্পূর্ণ ভাসিয়ে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু তাঁকে তার মুকাবিলায় অনড় অবিচল ও দুর্জয় হয়ে টিকে থাকতে হয়েছে। তিনি কেবল নিজেই তা থেকে রক্ষা পাননি, তাঁর প্রতি ঈমানদার অক্ষম দুর্বল ও অসহায় মানুষগুলোকও তিনি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে দেন নি। কোন্ অলৌকিক শক্তিবলে তিনি এই কঠিন অগ্নি-পরীক্ষায় নিজেও উত্তীর্ণ হলেন—উত্তীর্ণ হলেন তাঁর সঙ্গী-সাথীরাও? এই কঠিন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিঃসঙ্গ একাকীত্ব নিয়ে তিনি কোন্ পন্থায় ইসলামী দাওয়াতের সূচনা করলেন, তাকে এগিয়ে নিলেন, বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত কর্মপন্থা গ্রহণ করলেন, আঘাতের পর আঘাতেও ভেঙে পড়লেন না, দাউ দাউ করা তীব্র আগুনের দহনে দগ্ধ হয়েও ভস্ম হয়ে গেলেন না, সঙ্গী-সাথী কাউকে তা হতেও দিলেন না; বরং সেই আগুনে পুড়িয়ে মাটির মানুষগুলোকে খাঁটি স্বর্ণে পরিণত করে নিলেন—তা একটা প্রচণ্ড বিস্ময় বৈ কিছু নয়। এটা কি করে সম্ভব হল? চিন্তায় ও চরিত্রে তিনি কোন্ বৈপ্লবিক পরিবর্তন সৃষ্টি করেছিলেন? কোন্ ভালবাসার বন্ধনে বন্দী করে রেখেছিলেন তাঁর প্রতি ঈমানদার সেই দুর্বল অক্ষম লোকগুলিকে—যে কারণে তাঁরা একবার ঈমান গ্রহণের পর শত ঝড়-ঝঞ্ঝার প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্যের মুকাবিলায়ও তাঁর সাহচর্য এক মুহূর্তের জন্যও ত্যাগ করলেন না? এ আশ্চর্য ব্যাপারের মূলে কোন্ মহাসত্য নিহিত রয়েছে?

হিজরত রাসূল জীবনে এক ইতিহাস সৃষ্টিকারী ঘটনা। কেন তিনি তাঁর প্রাণপ্রিয়

জন্মভূমি ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হলেন? কোন্ পরিস্থিতিতে তাঁকে হিজরত করতে হয়েছিল? এ হিজরত কি মৃত্যুর ভয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাওয়া, না সুদীর্ঘ সংগ্রামের এক পর্যায়ে এসে বিশেষ রণকৌশলের ঐকান্তিক দাবিতে ফ্রন্ট পরিবর্তন?

হিজরতের পূর্ব ও পরবর্তী অবস্থার মধ্যে ইসলামের অব্যাহত সংগ্রামে কি পার্থক্য সূচিত হয়েছিল? পূর্ববর্তী পর্যায়ের তুলনায় পরবর্তী পর্যায় কি অভিনব পরিস্থিতি নিয়ে এসেছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবন-সাধনায়? হিজরত-পরবর্তী জীবনে তাঁর কর্মের ধারা ও রণকৌশলে কি ব্যতিক্রম সূচিত হয়েছিল?

আগেই বলেছি, তিনি ইসলামের শুধু প্রচারক বা তাবলীগকারীই ছিলেন না। নিছক তাবলীগই ছিল না তাঁর জিন্দেগীর মিশন। তিনি ছিলেন দীন-ইসলামের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠাতা। তাহলে তিনি কি প্রতিষ্ঠিত করলেন? তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসলামের বাস্তব রূপটা কি? বিশ্বমানবতার জন্য তা কোন্ অভিনব পথের সন্ধান দিয়েছে, কোন্ মহাকল্যাণ বয়ে নিয়ে এসেছে দীন-ইসলামের এই পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠা? তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত দীন-ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপটাই বা কি?

আজকের দিনে যাঁরা শুধু ইসলামের কিছু ধর্মীয় আচার-আচরণের শিক্ষা দিয়ে, অজ্ঞ মূর্খ লোকদের যিকির করিয়ে বা ফয়েয দিয়ে আত্মার স্বচ্ছতা বিধান করার অহমিকা বোধ করেন এবং শুধু কালেমা ও কয়েকটি নিতান্তই গুরুত্বহীন হাস্যকর কথার তাবলীগ করে রাসূলে করীম (স)-এর একান্ত অনুসারী-অনুগামী হওয়ার দাবি করেন তাদের সে দাবি কতটা যুক্তিযুক্ত? রাসূলের ঐতিহাসিক সংগ্রামী জীবনের সঙ্গে তা কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ?

সর্বোপরি রাসূলে করীম (স) কি দুনিয়ায় উদ্দেশ্যহীন বৈষয়িক জীবন যাপনের জন্য এসেছিলেন দুনিয়ার আরো লক্ষ কোটি মানুষের মত, না তাঁর জীবন ছিল সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট কোন মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিবেদিত? উদ্দেশ্য যদি কিছু থেকেই থাকে, তাহলে সে উদ্দেশ্যটা কি ছিল? সে উদ্দেশ্যের সঙ্গে দুনিয়ার সাধারণ মানুষের জীবনের সম্পর্ক কি? সে উদ্দেশ্যটা কি একান্তভাবে তাঁরই এবং তাঁর তিরোধানের সাথে সাথে সে উদ্দেশ্যেরও কি পরিসমাপ্তি ঘটেছে? কিংবা তাঁর সে উদ্দেশ্য সাধারণভাবে সমগ্র মানবতার এবং বিশেষভাবে তাঁর অনুসারী হওয়ার দাবিদার লোকদেরও এবং শাশ্বত?

মোটকথা, রাসূলে করীম (স)-এর জীবনী অধ্যয়নে এই সব প্রশ্নের সুস্পষ্ট ও অকাট্য জবাব পাওয়া একান্তই আবশ্যক। শুধু ইতিবাচক বা নেতিবাচক সংক্ষিপ্ত জবাবই যথেষ্ট হতে পারে না। সে জবাব হতে হবে খুবই বিশদ ও বিশ্লেষণমূলক, যেন সে ব্যাপারে

কারো মনে একবিন্দু সংশয় থেকে না যায়। অন্যথায় সে অধ্যয়ন বা শ্রবণে হয়ত কিছুটা সওয়াব পাওয়া যাবে, কিন্তু তাতে প্রকৃত সার্থকতা কিছুই লাভ হবে না। কার্যত তা নিতান্তই অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে।

পূর্বে যেমন বলেছি, রাসূলে করীম (স)-এর জীবন ছিল ব্যক্তি-মানুষ ও সমষ্টি-মানুষের জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগ সমন্বিত। একই ব্যক্তির জীবনীর এই সর্বব্যাপক ও সর্বাত্মক সমন্বয়তা ইতিহাসে অতুলনীয়—দৃষ্টান্তহীন।

একজন সত্যানুসন্ধানী যুবকের ব্যক্তিগত আচার-আচরণ ও জীবনধারার জন্য তাঁর জীবন উজ্জ্বলতর আদর্শ। একজন বিবাহিত পুরুষের স্ত্রী, সন্তান ও আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত জীবনের জন্যও তাঁর জীবন অনুকরণীয় আদর্শ। হালাল পথে রুজী-রোজগারে সচেষ্ট একজন পরিশ্রমী পুরুষের জন্যও উজ্জ্বলতম আদর্শ তাঁরই জীবনে নিহিত। দ্বীনের প্রতি আহ্বানকারী এবং বিরুদ্ধবাদীদের আঘাতে জর্জরিত একজন সংগ্রামী মানুষের জন্য তিনিই একমাত্র আদর্শ। একটি আদর্শভিত্তিক আন্দোলনের নেতার জন্যও তাঁর জীবন একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ। একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিরত সেনাধ্যক্ষের জন্য সুস্পষ্ট প্রোজ্জ্বল আদর্শ তাঁর জীবনীতেই রয়েছে। একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠাকারী দীর্ঘ সংগ্রামে বিজয়ীর জন্য, একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রের প্রধান তথা আদর্শ বাস্তবায়নে সংকল্পবদ্ধ রাষ্ট্র-প্রধানের জন্য তাঁরই মহাজীবন ও মহান জীবনীই একমাত্র আদর্শ। সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে আচার-আচরণের রীতি-নীতি তাঁর জীবনী থেকেই জানতে হবে। একজন ন্যায়নিষ্ঠ সুবিচারক, মানব কল্যাণকামী সমাজনেতা, স্নেহময় দরদী শিক্ষক, মানবতার দরদী বন্ধু, নির্যাতিত-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কল্যাণকামী এবং শ্রমিক-জনতার জীবনের অসংখ্য প্রকারের জটিল সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধানকামীর পক্ষেও পথের দিশা কেবলমাত্র তাঁরই জীবনালেখ্য থেকে লাভ করা সম্ভব।

তাই বলতে চাই, রাসূল (স)-এর জীবনী উদ্দেশ্যহীনভাবে নয়, উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ সামনে রেখেই অধ্যয়ন, বর্ণনা বা শ্রবণ করতে হবে। তা হলেই নবী-জীবন বা নবীচরিত আলোচনা আমাদের জন্য নিয়ে আসবে মহান আল্লাহর অফুরন্ত কল্যাণ ও রহমত। আর তা হলেই রাসূলে করীম (স)-এর জীবন-সংগ্রামকে অনুসরণ করে তাঁর নিকট থেকে প্রাপ্ত আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ তথা রাষ্ট্রবিপ্লবে উদ্বুদ্ধ হওয়া সম্ভবপর হবে আমাদের পক্ষে।

সত্য নবী সত্য রাসূল

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি ঘোষণা করেছিলেন ঃ

আমি আল্লাহ্‌র নবী ও রাসূল। আসমান-জমিনের মালিক আমাকে বিশ্বের সমগ্র মানুষের জন্য নবী ও রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন, যেন আমি তাদের নিকট বিশ্বস্রষ্টার চূড়ান্ত পয়গাম পৌঁছিয়ে দেই এবং বাস্তবে তা প্রতিষ্ঠিত ও বিজয়ী করে তুলি। আমার এই কথা যে সত্য মানবে ও আমার আনুগত্য করবে, সে সাফল্যমণ্ডিত হবে। আর যে তা করবে না, সে ধ্বংস হবে।

আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)-ই এই ঘোষণা উদাত্ত কণ্ঠে দিয়েছিলেন। এই ঘোষণা ছিল বিপ্লবাত্মক, অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও চ্যালেঞ্জমূলক। এ ঘোষণা প্রথম যখন উচ্চারিত হয়েছিল, তখনও যেমন চতুর্দিকে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল, আজও তার আলোড়নের তরঙ্গমালা মানব সমুদ্রের দিগন্তব্যাপী বেলাভূমে আঘাত হানছে। সে দিনকার মানুষ যেমন এই দিগন্ত প্রকম্পক ঘোষণাকে উপেক্ষা করতে পারেনি, আজকের বিশ্বমানবও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ঘোষণার প্রতি কর্ণপাত করতে ও যুক্তির কষ্টি-পাথরে তা যাচাই করতে বাধ্য। কেননা এই ঘোষণা যেমন চিরন্তন, তেমনি বিশ্বজনীন। সেদিন যেমন এই ঘোষণা ছিল নতুন, আজও তেমনি এর ওপর প্রাচীনত্বের একবিন্দু ছাপ পড়েনি। সেদিন এই ঘোষণার সত্যাসত্য যাচাই ছিল অপরিহার্য, আজকের বিশ্বমানবের জন্যও তা তেমনি অপরিহার্য। প্রশ্ন হচ্ছে ঃ এই ঘোষণা কি সত্য-ভিত্তিক? এর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন কি সম্ভব?

বস্তুত কোন ঘোষণাই উপেক্ষণীয় নয়। বিদগ্ধ সমাজের লোকদের সম্মুখে যখনই কোন ঘোষণা উচ্চারিত হয়, তখন তাদের নিকট তার ঐকান্তিক দাবি এ-ই হয়ে থাকে যে, বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা অবশ্যই তার মূল্যায়ন ও যাচাই-পরীক্ষা করে দেখবেন। কেননা বিশ্বজনীন যে কোন দাবি ও ঘোষণাকে যাচাই পরখ করা এবং যাচাই পরখে যা উত্তীর্ণ হয় তা গ্রহন করা, যা উত্তীর্ণ হয় না—গ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হয় না, তা অবলীলাক্রমে দূরে নিক্ষেপ করা বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের এক বিরাট দায়িত্ব বটে।

শুধু তা-ই নয়, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পূর্বোদ্ধৃত ঘোষণাটি বিশ্বমানবের ইহজীবন ও পরজীবনের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। ঘোষণাকারী সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, তাঁর ঘোষণাকে সত্য মেনে নিয়ে তাঁর আনুগত্য অবলম্বন করলে ইহ-পরকালের সাফল্য লাভ সম্ভব হবে; অন্যথায় ধ্বংস অনিবার্য। সে ধ্বংস কেবল পরকালীনই নয়, ইহকালীনও। আর কোন মানুষই তো নিজের ধ্বংস চাইতে পারে না—না ইহকালীন, না পরকালীন।

উভয় জগতে সাফল্যই সব মানুষের কাম্য, সব মানুষের জন্য একান্তই প্রয়োজনীয়। আর এই ঘোষণা যদি বাস্তবিকই সত্য না হয় আর আমরা যদি তা গ্রহণ না করি, তাহলে হয়ত আমাদের কিছুই আসবে যাবে না। কিন্তু যদি সত্য হয়, তাহলে তা গ্রহণ না করার পরিণতি তো অত্যন্ত মারাত্মক।

ঘোষণাটির সত্যাসত্য যাচাইয়ের মানদণ্ড

তাই মুহাম্মাদ (স)-এর উপরোক্ত ঘোষণার সত্যাসত্য অবশ্যই আমাদের যাচাই করতে হবে। বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, তিনি প্রকৃতই আল্লাহ্র রাসূল কিনা? তাঁর রাসূল হওয়া ও না-হওয়ার ওপরই নির্ভর করে তাঁর সাথে আমাদের আচরণ কি হবে। কেননা তাঁর দাবির সত্যতা প্রমাণিত হওয়া ও না-হওয়া অবস্থায় তাঁর সাথে আমাদের আচরণ কখনই অভিন্ন হতে পারে না।

মুহাম্মাদ (স)-এর উপরোক্ত দাবির সত্যাসত্য যাচাই করা কতিপয় সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতেই সম্ভবপর। প্রকৃত সত্য নবী ও রাসূল হওয়া প্রমাণের জন্য এ মানদণ্ড অত্যন্ত শানিত ও অপরিহার্য। এ পর্যায়ে আমরা এখানে মাত্র ছয়টি ধারার উল্লেখ করব।

১) কারোর প্রকৃত রাসূল হওয়ার সত্যতার ব্যাপারে সর্বপ্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজে সুস্পষ্ট ভাষায় এই দাবি উপস্থাপন করছেন, না সাধারণ মানুষ তাঁকে নবী ও রাসূলের আসনে বসিয়েছে। তিনি নিজে কি এ বিষয়ে কোন দাবিই উত্থাপন করেন নি? কেননা সাধারণ মানুষের পক্ষে কোন ব্যক্তিকে নবী বা রাসূল নামে অভিহিত করা নিতান্তই অর্থহীন হয়ে যায়, যদি তিনি নিজে এ প্রসঙ্গে কিছুই না বলে থাকেন। কে প্রকৃত নবী ও রাসূল তা সাধারণ মানুষের জানা থাকা সম্ভব নয়। মূল দাবি তো স্বয়ং তাঁকেই উত্থাপন করতে হবে। সাধারণ মানুষের কাজ হচ্ছে তাঁর এই দাবির সত্যতা বিশ্বাসযোগ্য হলে তাঁকে মানবে, অন্যথায় এড়িয়ে যাবে।

২) নবী-রাসূল হওয়ার দাবি যিনি করবেন, সাধারণ নৈতিকতা ও মানসিকতার দিক দিয়ে তাঁকে সর্বোচ্চ মানে উন্নীত হতে হবে। তিনি বড় বড় ব্যাপার তো দূরের কথা, খুব ছোটখাট ব্যাপারেও কখনো একবিন্দু মিথ্যা বলবেন না। তিনি মিথ্যা বলতে পারেন—এমন কথা তাঁর সম্পর্কে চিন্তাও করা যাবে না। কেননা মিথ্যা বলা যার অভ্যাস বা মিথ্যাকে এড়িয়ে যাওয়ার মত নৈতিক বল যার নেই, তার পক্ষে বিশ্বস্রষ্টা সম্পর্কেও মিথ্যা বলা অসম্ভব মনে করা যায় না। কিন্তু যিনি মিথ্যাকে শুধু ঘৃণাই করেন না, সর্বব্যাপারে মিথ্যাকে, ধোকা-প্রতারণাকে, বিশ্বাসঘাতকতাকে সম্পূর্ণ ও সর্বতোভাবে এড়িয়ে চলেছেন, তাঁর সম্পর্কে নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করা যায় যে, তিনি কোনক্রমেই মিথ্যা-মিথ্যি নিজেকে আল্লাহ্র নবী-রাসূল বলে দাবি করবেন না। তা হবে পরম ও চরম সত্য। যার চরিত্রে ও আচার-আচরণে মিথ্যার দূরতম আভাসও পাওয়া যাবে, তাকে নবীরূপে বিশ্বাস করা তো দূরের কথা, একজন সুস্থ-ভদ্র মানুষরূপেও মনে স্থান দেয়া যেতে পারে না।

৩) কারোর নবী-রাসূল হওয়ার একটা প্রমাণ এই যে, কোন ব্যক্তি বা শক্তিই তাঁকে অক্ষম বা পরাজিত করতে পারবে না। যে দিক দিয়েই কেউ তাঁর সাথে সংঘর্ষে আসবে, সে-ই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সমগ্র জাতি ও জনগোষ্ঠী মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁকে দুর্বল, অক্ষম ও প্রভাবহীন বানাতে চাইলেও সে কাজে তারা সফল হবে না। সকলেরই মুকাবিলায় নবী-রাসূলই সফল ও বিজয়ী হবেন। তার কারণ, কেউ যখন নিজেকে আল্লাহর নবী-রাসূলরূপে পেশ করেন, তখন তার অর্থ হয় সমগ্র বিশ্বলোকের স্রষ্টা, সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি ও ক্ষমতার নিরংকুশ অধিকারী আল্লাহর প্রতিনিধি ও মনোনীতি ব্যক্তি হওয়ার দাবি করা। যে লোক বাস্তবিকই এরূপ মর্যাদার অধিকারী হবেন, কোন জিনিসই তাকে পরাজিত-পরাভূত করতে পারবে না; কোন দিক দিয়েই তাঁর অক্ষম হওয়ার প্রশ্ন উঠতে পারে না। তিনি হবেন সর্বোপরি, সর্বজয়ী। যে দিক দিয়েই তাঁকে যাচাই করা হবে তাঁকে উন্নীতই পাওয়া যাবে।

৪) যিনি হবেন প্রকৃত নবী ও রাসূল, তাঁর কথা বিশ্বলোক নিহিত সমগ্র সত্যের সাথে পুরোমাত্রায় সঙ্গতিশীল হবে। অন্য কথায়, বিশ্বলোক নিহিত সত্য এবং তাঁর কথা হবে সম্পূর্ণ অভিন্ন। এভাবেও বলা যায়—তাঁর কথাই হবে বিশ্বলোক নিহিত সত্য এবং বিশ্বলোক নিহিত সত্যই হবে তাঁর কথা। মানব প্রকৃতি ও জীবনের স্বভাবসম্মত ও ভারসাম্যপূর্ণ দাবিসমূহই হবে তাঁর কথার বাস্তবতা। তাঁর কথা হবে সর্বাত্মক, সর্বব্যাপী। কোন একটি দিকও এমন হবে না যা মানব জীবনে অত্যন্ত জরুরী, অথচ সে বিষয়ে তিনি কোন কথাই বলেননি, দেননি কোন দিগদর্শন। নবী ও দার্শনিকের মধ্যে এখানেই পার্থক্য। দার্শনিক নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা ও বিবেক-বুদ্ধির জোরে কথা বলে। এ জন্য তার কথা বিশেষ সময় ও বিশেষ সামাজিক-পারিপার্শ্বিক অবস্থায় কিছুটা সত্য হলেও সে সময়ের অবসান ও অবস্থার পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে তা অবাস্তব ও মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তত্ত্ব ঘোষণায় ও তথ্য পরিবেশনে সে বারবার ভুল করে, এক সময়ের ঘোষণা পর মুহূর্তেই প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু নবী-রাসূল তো বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহর কথা প্রচার করেন, আল্লাহর দেয়া ইলমের ভিত্তিতে কথা বলেন। আর আল্লাহর সমীপে তো সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য চির উদঘাটিত, তাঁর নিকট অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত একাকার। এ কারণে তাঁর কালাম সামগ্রিক সত্যের ধারক ও প্রকাশক হবে—এটাই স্বাভাবিক। প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে রাসূল (স)-এর প্রচারিত কথা; প্রকৃতি-নিহিত পরম সত্যের সাথে তা কখনই সাংঘর্ষিক হবে না।

৫) এ পর্যায়ের কথাটি কেবলমাত্র শেষ নবী-রাসূল সম্পর্কিত। তাঁর আবির্ভাব সময়ে পূর্ব থেকে চলে আসা বহু ধর্ম দুনিয়ায় বিরাজমান ছিল। তাই সেসব ধর্মের বিরাজমান থাকা অবস্থায় নতুন কোন ধর্ম প্রচারকের আগমন এবং তাঁর মাধ্যমে নতুন কোন ধর্মমত প্রচারিত হওয়ার কোন প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল কি? এ বিষয়ে চলমান ধর্মমতেরই বা বক্তব্য কি ছিল? নতুন নবীর আগমনের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে বলে কোন ধর্মমত প্রকাশ করেছে কি?

৬) এ পর্যায়ের কথাও বিশেষভাবে শেষ নবীর সাথে সংশ্লিষ্ট। যে নবীর ঘোষণা ও দাবির সত্যাসত্য আমরা যাচাই করতে চাচ্ছি, তাঁর দেয়া শিক্ষা ও উপস্থাপিত আদর্শ কি বর্তমান সময় পর্যন্ত পুরামাত্রায় সংরক্ষিত আছে? এমন কোন রেকর্ড আছে কি, যার মাধ্যমে তাঁর প্রচারিত আল্লাহ্‌র কথাসমূহ নির্ভুল ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে জানা যেতে পারে? কেননা যার প্রচারিত শিক্ষা তার আসল অবস্থায় সংরক্ষিত নেই, তাকে ঐতিহাসিকভাবে নবী মেনে নিলেও বর্তমানে তার নবী হওয়া এখনকার মানুষের জন্য অর্থবহ হতে পারে না। বুঝতে হবে, অতীতের কোন এক সময়ে তিনি আল্লাহ্‌র নবী থাকলেও আজকের মানুষের জন্য তিনি কোনক্রমেই নবীরূপে প্রেরিত হতে পারেন না। তাঁর নবুয়্যাত দ্বারা এ কালের মানুষের কোন কল্যাণই সাধিত হতে পারে না, যেহেতু কাউকে নবী মেনে নেয়া নিছক ঐতিহাসিক প্রয়োজন নয়, তাঁর প্রয়োজনীয়তা এখনকার জন্য সম্পূর্ণ বাস্তব। তাঁর শিক্ষা এখনকার লোকদের পক্ষে সম্পূর্ণ জানতে পারা একান্তই আবশ্যক এবং সেজন্য তাঁর সেই শিক্ষাকে সকল বিকৃতি, রদ-বদল ও কাট-ছাঁটের করাল গ্রাস থেকে সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত থাকতে হবে অবশ্যম্ভাবীরূপে। অন্যথায় তাঁকে নবী মেনে নেয়া সম্পূর্ণ অর্থহীন হবে।

আমরা এখানে মোট ছয়টি ধারার একটি পূর্ণাঙ্গ মানদণ্ড পেশ করেছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, একজন নবীর নবুয়্যাতের দাবির সত্যাসত্য যাচাই করার জন্য এই কয়টি বিষয় যথেষ্ট। এ কয়টি ছাড়া আরও কোন কোন দিককে সম্মুখে আনা যেতে পারে। কিন্তু এ ধরনের যে কোন দিকেরই উল্লেখ করা হোক না কেন, আমরা মনে করি তা ওপরে বর্ণিত কোন-না-কোন ধারারই অধীন গণ্য হবে। তাই আমাদের উপস্থাপিত এ ধারাসমূহের ভিত্তিতে আমরা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপরিউক্ত দাবির সত্যাসত্য যাচাই করলে তা সর্বশ্রেণীর বৈদগ্ধসম্পন্ন ব্যক্তির নিকটই গ্রহণযোগ্য হবে। অতপর আমরা এক একটি ধারার ভিত্তিতে যাচাইয়ে কাজ শুরু করব।

সত্যাসত্য পর্যালোচনা

প্রথমোক্ত ধারাটির ভিত্তিতে যাচাই করা হলে সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, তার ভিত্তিতে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পূর্বোক্ত ঘোষণাটি সর্বতোভাবে ও সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হতে পারে। তিনি বারবার অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, তিনি বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহ্ তা'আলার নবী ও রাসূল আর এ ঘোষণা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এ ঘোষণায় কোন অস্পষ্টতা বা গোঁজামিলের একবিন্দু প্রশ্রয় দেয়া হয় নি। তিনি যে পবিত্র গ্রন্থকে জনগণের সম্মুখে পেশ করে দাবি করেছেন যে, এ গ্রন্থ তাঁর নিজের রচিত নয়, বরং সেই মহান আল্লাহ্‌রই কালাম, যিনি তাঁকে নবী ও রাসূলরূপে মনোনীত করে এটি তাঁর প্রতি নাযিল করেছেন, সেই গ্রন্থের পাঁচটি স্থানে তাঁর নামের উল্লেখ সহকারে বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর রাসূল। কুরআনের সূরা আল-ইমরানের ১৪৪ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ – قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ –

মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল (রাসূল বৈ আর কিছু নয়); তাঁর মত আরও বহু সংখ্যক রাসূল দুনিয়ায় এসে চলে গেছে।

সূরা আল-আহ্‌যাবের ৪০ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ -

মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের কোন একজনের পিতা নয়; বরং আল্লাহ্‌র রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।

কুরআনের ৪৭ নং সূরাটির (সূরা মুহাম্মাদ) নামকরণ করা হয়েছে তাঁরই নামে। সে সূরাটির দ্বিতীয় আয়াতটি এই ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ -

যারা ঈমান এনেছে ও ঈমানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আমল করেছে এবং মুহাম্মাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছে—যা সত্য সত্যই আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অবতীর্ণ—তাদের যাবতীয় দোষত্রুটি আল্লাহ্‌ বিদূরিত করে দেবেন এবং তাদের অবস্থা কল্যাণময় করে দেবেন।

সূরা আল-ফাতহ-এর ২৯ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ -

মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল।

সূরা আস-সাফ-এর ৬ আয়াতে হযরত ঈসা (আ)-এর জবানীতে ঘোষিত হয়েছে ঃ

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ -

মরিয়াম—পুত্র ঈসা যখন বলল ঃ হে ইসরাঈল বংশধররা! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূল, তওরাতের—যা আমার সম্মুখে বর্তমান তার—সত্যতা ঘোষণাকারী এবং এক রাসূলের সুসংবাদদাতা, যে আমার পরে আসবে, যার নাম আহমদ।

আয়াতের দুটি কথা প্রণিধানযোগ্য। একটি, হযরত ঈসা (আ)-ও নিজেকে আল্লাহ্‌র রাসূল বলে সুস্পষ্ট দাবি উচ্চারণ করেছেন। নবী-রাসূলগণের সত্যতার এ যে একটি অন্যতম প্রধান প্রমাণ, তা এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। আর দ্বিতীয়, এ আয়াতে

মুহাম্মাদ (স)–এর আগমনের সুসংবাদ দিয়ে তাঁর নাম 'আহমদ' বলা হয়েছে। এর অর্থ, আহমদ এবং মুহাম্মাদ দুটিই তাঁর একার নাম।

উপরোদ্ধৃত পাঁচটি স্থানে নামের উল্লেখসহ বলা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্র নবী ও রাসূল। তিনি কুরআনের এরূপ আয়াত পাঠ করে লোকদের সামনে একসাথে দুটি কথার ঘোষণা দিতেন। প্রথম, তিনি যে আল্লাহ্র নবী ও রাসূল তা স্বয়ং আল্লাহ্—যিনি তাঁকে নবী ও রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন—নিজেই ঘোষণা করেছেন। আর দ্বিতীয়, এই কালাম তাঁর নিজের রচিত নয়, যে আল্লাহ্ তাঁকে নবী ও রাসূল হিসেবে মনোনীত ও নিয়োজিত করেছেন, সেই আল্লাহ্-ই তাঁর নিজের কালাম তাঁর প্রতি নাযিল করেছেন।

এ ছাড়াও কুরআনে বহুতর আয়াতে নামের উল্লেখ ছাড়াই অন্যভাবে তাঁর নবী ও রাসূল হওয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে।

কুরআন ছাড়াও তিনি নিজের মুখের কথা ও ভাষণের মাধ্যমে তাঁর নবী ও রাসূল হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। হুনাইনের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে এই বাক্যটি তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত ও ধ্বনিত হয়েছিল ঃ

اَنَا النَّبِىُّ لاَكَذِبَ - اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ -

আমি নবী, বিন্দুমাত্র মিথ্যা নয়। আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর।

এ পর্যায়ের বহু কথা বহু হাদীসেও বিধৃত রয়েছে। এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মুহাম্মাদ (স) লোকদের বানানো কোন নবী বা রাসূল ছিলেন না। তিনি নিজেই বারবার সুস্পষ্ট ভাষায় আল্লাহ্র নবী ও রাসূল হওয়ার দাবি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। তাই আমরা যদি তাঁকে বলি, আপনি সত্যই আল্লাহ্র নবী ও রাসূল, তাহলে কার্যত তাঁর নিজের উপস্থাপিত দাবি ও ঘোষণার সত্যতাই স্বীকার করে নিই, আমাদের নিজেদের কল্পিত কোন বিশ্বাসকে তাঁর ওপর চাপাই না।

দ্বিতীয় ধারার দৃষ্টিতে আমরা যখনই হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবন চিত্রের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তখনই স্পষ্টত দেখতে পাই, তিনি এক নিষ্কলুষ চরিত্রে ভূষিত মহান ব্যক্তিত্ব। জাহিলিয়াতের যুগে যখন সে দেশের সাধারণ মানুষের নৈতিক চরিত্রের চরম অধঃপতন ঘটেছিল, সার্বিক মানবীয় চরিত্র সকল প্রকারের হীনতা, নীচতা, অশ্লীলতা, যৌনতা, পাশবিকতা, জঘন্যতা, বীভৎসতার নিম্নতম পংকে নিমজ্জিত হয়েছিল, হানাহানি, মারামারি, হিংস্রতা, বিদ্বেষপরায়ণতা ও পরশ্রীকাতরতা মানবীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যখন লুণ্ঠতরাজ, পরস্বাপহরণ ও অন্যের অধিকার হরণের প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল, তখন এই সব কিছুর মধ্যে জন্মগ্রহণ ও লালিত-পালিত-বর্ধিত হওয়া সত্ত্বেও উপরোক্ত মলিনতার একটি ছিঁটেও তাঁকে একবিন্দু স্পর্শ করতে পারেনি। এটা যখন আমরা দেখি, তখন বিস্ময়ে হতবাক হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

দিলেন, তখন মক্কার প্রায় সব লোকই তাঁর চরম শত্রুতে পরিণত হয়ে ছিল। সর্বশক্তি দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধতা ও তাঁর কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিই ছিল সকলের নিত্যকার কর্মতৎপরতা। ঠাট্টা-বিদ্রূপ থেকে শুরু করে দৈহিক নির্যাতন পর্যন্ত কোন কিছুই তারা বাদ রাখেনি। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, এই সময়ও তাঁর চরিত্র সম্পর্কে কেউই কোন খারাপ উক্তি করেনি। তাঁর কোন দোষের কথা কেউ বলেনি—বলতে পারেনি। তারা তাঁকে কবি, গণক, পাগল ইত্যাদি সবই বলেছে; কিন্তু কোন একজন লোকও তাঁর চরিত্র সম্পর্কে কোন অভিযোগ তুলেনি, অভিযোগ তুলবার কোন অবকাশই ছিল না; বরং সেই বৈরী সময়েও তারা সকলেই মক্কার লোকদের মধ্যে তাঁকে সর্বোৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী বলে স্বীকার করত। তিনি পিতৃ-পুরুষ ও সমাজের লোকদের সাধারণ ধর্মমতকে প্রত্যাখ্যান করে এক নতুন জীবন-দর্শন ও জীবন-বিধান উপস্থাপন করে সম্পূর্ণ ভিন্নতর পথ অবলম্বন করেছেন। তিনি মক্কার লোকদের পরিবারে ও জন-জীবনে বিচ্ছিন্নতা ও অশান্তির সৃষ্টি করেছেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে তারা অভিযোগ করেছে, দোষারোপ করেছে, একথা ঠিক। কিন্তু তিনি যে একজন সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ, আমানতদার; তিনি কাউকে ধোঁকা দেন না, বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করেন না, কারোর হক নষ্ট করেন না, কারোর সম্পদ হরণ করেন না—একথা তখনও তারা অকপটে স্বীকার করত। মক্কার লোকেরা প্রায় সকলেই তাঁর প্রতি চরম শত্রুতার আচরণ করত; কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের মূল্যবান দ্রব্যাদির সংরক্ষণের জন্য তাঁরই নিকট আমানতও রাখত। মানব ইতিহাসের চরম বিস্ময়কর সত্য—যার দৃষ্টান্ত দুনিয়ায় অপর কোন ব্যক্তিতে দেখানো কদাচ সম্ভব নয়—তাঁকে চূড়ান্তভাবে ও চিরদিনের তরে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার সামষ্টিক সিদ্ধান্ত নিয়ে অস্ত্রধারী লোকেরা যখন তাঁর বাসস্থান পরিবেষ্টন করে দাঁড়িয়েছিল, তিনি ঘর থেকে বের হলে সম্মিলিত অস্ত্রাঘাতে তাঁকে শেষ করে দেয়ার কাঙ্ক্ষিত মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিল, ঠিক তখনও তাঁর নিকট মক্কার লোকদের বিপুল পরিমাণ ও মহামূল্যবান আমানত সংরক্ষিত ছিল এবং সকাল বেলা তা মালিকদের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্বও তিনি বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

তাঁর সততা ও সত্যবাদিতা অস্বীকার করা তো দূরের কথা, রোমান সম্রাট কাইজারের দরবারে দাঁড়িয়ে আবু সুফিয়ানের ন্যায় একজন বৈরী কুরাইশ সরদারকেও অকপটে তাঁর সত্যবাদিতার সাক্ষ্য দিতে হয়েছে। কাইজার তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমাদের দেশে যে ব্যক্তি নবুয়্যাতের দাবি করছে, তাঁকে কি তোমরা কখনও মিথ্যা বলতে শুনেছ? আবু সুফিয়ান বললেন, কখনই নয়। জিজ্ঞাসা করা হল, সে কি কখনও ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি ভঙ্গের কাজ করেছে? আবু সুফিয়ান বললেন, এখন পর্যন্ত সে কখনই চুক্তি বা ওয়াদা ভঙ্গ করেনি। এ কথা শুনে কাইজার বলল : যে ব্যক্তি মানুষের নিকট কখনও মিথ্যা বলেছে—এমন প্রমাণ নেই, সে এখন আল্লাহর সম্পর্কে এত বড় একটা মিথ্যা কথা বলবে, তা কল্পনাই করা যায় না।

তাঁর জীবনের এই দিকটা পূর্ণমাত্রায় উজ্জ্বল-প্রতিভাত। তাই তিনি আল্লাহর নবী ও রাসূল হওয়ার যে দাবি পেশ করেছেন, তাতে তিনি ছিলেন দৃঢ় ও বলিষ্ঠ। অন্য কোন

দুনিয়ার প্রাচীনতম কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সব মতবাদ ও আন্দোলনেই এই দুটি বৈপরীত্য অনস্বীকার্যতাকে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মুহাম্মদ (স)-এর দাওয়াতে সে বৈপরীত্যের নাম-চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

দুনিয়ার ধর্মগুরুদের প্রচারিত শিক্ষা সাধারণত বৈরাগ্যবাদী। তাতে বৈষয়িক জীবনের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে একান্তভাবে আল্লাহমুখী হয়ে তাঁরই ধ্যানে নিমগ্ন হওয়ার উপদেশ রয়েছে। তাঁদের মতে, মানুষের মুক্তির পথ বৈষয়িকতার মধ্য দিয়ে [illegible] বাইরে থেকে চললেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

কিন্তু মানব জীবন সম্পর্কিত এই ধারণা (Conception) বিশ্বব্যবস্থার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। মানুষকে যে সব কাজের যোগ্যতা দেয়া হয়েছে, তা এই দুনিয়ারই প্রযোজ্য [illegible] রয়েছে, তা সেই যোগ্যতার দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার জন্যই। কিন্তু এসব ধর্মের শিক্ষায় এই যোগ্যতার কোন প্রয়োগ নেই। এসব দ্রব্য-সরঞ্জামেরও কোন ব্যবহার নেই। সুতরাং দুনিয়ার সব মানুষ সে শিক্ষা গ্রহণ করলে দুনিয়াটাই অর্থহীন হয়ে যাবে। [illegible] সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়বে। শুধু তাই নয়, বরং মানব প্রজাতির অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যেতে বাধ্য হবে। এ থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে, এসব ধর্ম বিশ্ব ও মানুষের স্রষ্টার প্রদত্ত নয়, তা হতেই পারে না। কেননা বিশ্বস্রষ্টা দুনিয়াকে এক ধাঁচে বানাবেন আর মানুষকে বানাবেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত ধাঁচে ও প্রকৃতিতে — এরূপ ধারণা শুধু অর্বাচীনই করতে পারে।

কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপস্থাপিত দীন এই বৈপরীত্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি মানুষকে দুনিয়া ত্যাগের — বৈরাগ্যবাদের শিক্ষা দেন নি; বরং একদিকে তিনি মানুষের যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার সুষ্ঠু প্রয়োগের পন্থা শিখিয়েছেন, অপরদিকে দুনিয়ার প্রাপ্য দ্রব্য-সরঞ্জামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সেগুলোর ব্যবহার পদ্ধতির বাস্তব শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দুনিয়ার সব কিছু আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ব্যবহার ও ব্যবস্থা করার দায়িত্ব মানুষের ওপরই অর্পিত হয়েছে। সেই সাথে ব্যক্তি-জীবন, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা উপস্থাপন করে তিনি তদনুযায়ী সব কিছু পরিচালনের পথ-নির্দেশও দিয়েছেন। ফলে তাঁর উপস্থাপিত দীন এই বিশ্ব-ব্যবস্থার সাথে পুরাপুরি সামঞ্জস্যশীল প্রমাণিত হয়েছে।

ধর্মীয় পর্যায়ের বৈপরীত্য সম্পর্কে এ কথা গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ ও অনুধাবনের দাবি রাখে।

অপরদিকে বর্তমান দুনিয়ার বস্তুবাদী মতাদর্শ ও আন্দোলনসমূহের অন্তর্নিহিত বৈপরীত্যও অত্যন্ত মারাত্মক। সেগুলোতে সাধারণ ব্যক্তি পর্যায়ের ধারণাকে সমাজ ও সামষ্টিক পর্যায়ের ধারণার সাথে প্রচন্ডভাবে সাংঘর্ষিক লক্ষ্য করা যায়। এসব মতবাদের সামষ্টিক কার্যসূচীর লক্ষ্য হচ্ছে শান্তিপূর্ণ, সচ্ছল ও স্বাচ্ছন্দ্যময় সমাজের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এসব মতাদর্শের প্রবক্তারা যখনই বলেন, মানুষের লক্ষ্য বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতা, তখনই তাঁদের প্রথম বলা কথার প্রতিবাদ করা হয়। তাঁরা গোটা সমাজকে যেভাবে

দেখতে চান, ব্যক্তিদেরকে তার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করেন। এ কারণে এসব মতাদর্শের আন্দোলনে আন্দোলনকারীদের পারস্পরিক সংঘর্ষ নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ফলে এসব মতাদর্শ মানুষের জন্য কল্যাণকর বিধান উপস্থাপনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে।

বস্তুগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য জীবনের লক্ষ্য হলে সমাজের মধ্যে ব্যাপক কাড়াকাড়ি ও মারামারি শুরু হওয়া অনিবার্য। কম আয়ের লোকেরা বেশী সম্পদের অধিকারীদের শুধু সম্পদই কেড়ে নেবে না, তাদের জীবনকেও শেষ করে দেবে। বস্তুত বৈষয়িক সুখ-শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের লোভ গোটা সমাজকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারে। বর্তমানে দুনিয়ায় এসব মতাদর্শের লেলিহান শিখা বিশ্বমানবতার চরম ধ্বংস ডেকে এনেছে।

কিন্তু বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স) বস্তুগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনকে মানব জীবনের উদ্দেশ্য বলেন নি। তিনি জীবনের লক্ষ্য হিসেবে যা উপস্থাপন করেছেন, তা ব্যক্তি ও সমাজ-সমষ্টিকে পরস্পরের সহযোগী ও সহায়ক বানিয়ে দেয়। তিনি ঘোষণা করেছেন, বস্তুগত কোন জিনিস নয়, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই সমস্ত মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সকলকেই কাজ করতে হবে পরকালীন সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে। এ ব্যাপারে পারস্পরিক সংঘাত নয়, ঐক্য ও সম্প্রীতি স্থাপনই হওয়া উচিত সকল মানুষের কাম্য। এখানে কাউকে বঞ্চিত করলে নিজের লাভ নেই; বরং বিরাট ক্ষতি। অন্যকে ঠকালে নিজেকেই ঠকতে হবে; অন্যের উপর পীড়ন চালালে নিজেকেই কঠিনভাবে পীড়িত ও জর্জরিত হতে হবে। তাই দেশ ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হওয়াই হবে সকলের প্রেরণা। কেননা তাতেই নিজের কল্যাণ লাভ সম্ভব। তাই প্রতিযোগিতা নয়, পরম সহযোগিতাই মানব চরিত্রের ভূষণ হবে। কেউ কারোর প্রতি হিংসা বা বিদ্বেষ পোষণ করবে না। সকলকেই ঐকান্তিক বন্ধু ও একই পথের পথিক রূপে গ্রহণ করা প্রত্যেকের মনের স্বাভাবিক হয়ে দেখা দেবে।

এই দ্বীনে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের স্বার্থ সাংঘর্ষিক নয়; বরং পরস্পর সামঞ্জস্যশীল। এ সত্য নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রবর্তিত দ্বীন স্বয়ং আল্লাহর নিকট থেকেই অবতীর্ণ। তিনিই মানুষের স্রষ্টা, এই দ্বীনেরও রচয়িতা। এ কারণে মানব-প্রকৃতি ও এই দ্বীনের মাঝে কোন সাংঘর্ষিকতা তো নেই-ই; বরং রয়েছে পরিপূর্ণ সাযুজ্য ও সঙ্গতি (Consistency)। কুরআনের এই বিশেষত্বের কথা আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন ঃ

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ط وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا -

ওরা কুরআনকে গভীর অভিনিবেশ সহকারে পড়ে না কেন? তা যদি অ-খোদা বা গায়রুল্লাহর নিকট থেকে এসে থাকত, তাহলে ওরা তাতে খুব বেশী বৈপরীত্য দেখতে পেত। (সূরা আন-নিসা ঃ ৮২)

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবুয়্যাত ও রিসালাতের সত্যাসত্য যাচাই-পরখ করার পরম মানদণ্ডের দিক দিয়েও তাঁকেই পরম সত্য নবীরূপে মেনে নিতে হয়। আল্লাহ্ এরূপ একজন নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন, এটা আমাদের জন্য তাঁর অশেষ-অসীম অনুগ্রহের কারণ সন্দেহ নেই। শুধু তা-ই নয়, অতীত ধর্মসমূহে নিহিত দুটি কারণ আল্লাহ্র সর্বশেষ নবী ও রাসূল আসার সুতীব্র ও অ-উপেক্ষণীয় দাবি জানায়।

বস্তুত ধর্ম হচ্ছে বিশ্বস্রষ্টার ইচ্ছা ও মর্জী জানবার মাধ্যম। দু-একটি ধর্ম ছাড়া দুনিয়ার অনেক ধর্মই বিশ্বস্রষ্টার দেয়া ধর্ম বলে দাবি করে। কিন্তু সে সব ধর্ম অধ্যয়ন করলে বিশ্বস্রষ্টার মর্জী যে কি, তা জানা যায় না। এসব ধর্মের পারস্পরিক পার্থক্যও মৌলিক আবার কোন কোন ধর্ম বিশ্বস্রষ্টা হিসেবে কাউকে মানেই না কিংবা মানলেও তার সাথে এসব মানব জীবনের কোন সম্পর্কই নেই। এমন ধর্মও আছে, যার অনুসারীদের মধ্যে বিশ্বাসের দিক দিয়ে ঐক্য ও সামঞ্জস্য একেবারে অনুপস্থিত। কেউ আল্লাহ্কে এক স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে মানে, কেউ বিশ্বাস করে সৃষ্টিতেই স্রষ্টা লীন হয়ে গেছেন। কারোর মতে, স্রষ্টাই অবতার হয়ে মানুষের নিকট আগমন করেছেন। কেউ মূর্তিপূজা করে, কেউ মূর্তিপূজাকে ঘৃণা করে ও সযত্নে এড়িয়ে চলে। অথচ সকলেই সেই একই ধর্মের অনুসারী।

ধর্মসমূহের এই পারস্পরিক গরমিল প্রমাণ করে যে, তার কোনটিই আসল রূপে বর্তমান নেই, তা বিকৃত হয়েছে বহু পূর্বে। মানুষই আল্লাহ্র প্রেরিত ধর্মে এই বিকৃতি নিয়ে এসেছে। এসব কারণে আল্লাহ্র জন্য জরুরী হয়ে পড়ে মানুষের নিকট তাঁর প্রকৃত ধর্মকে নতুন করে পাঠাবার। আর শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-ই হচ্ছে সেই আসল ও প্রকৃত ধর্মের বাহক।

এছাড়া বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে দেখা যায়, পূর্বে আগমনকারী নবী ও ধর্মপ্রচারকগণ নানাভাবে শেষ নবীর আগমনের সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস হচ্ছে, পৃথিবী যখন অন্যায়-অসত্যে পূর্ণ হয়ে যায়, তখন স্বয়ং আল্লাহ্ই অবতাররূপে মানুষের মধ্যে চলে আসেন এবং দুনিয়ার সংশোধন করেন। ভগবান গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন:

> হে অর্জুন। যখন যখনই ধর্মে (কর্তব্য পালনে) পতন ঘটে এবং অধর্ম প্রবল হয়ে উঠে, তখন আমি নিজেই অবতার হিসেবে জন্মগ্রহণ করি। আমি সৎ লোকদের উদ্ধার ও বদ লোকদের বিনাশ সাধনের লক্ষ্যে প্রকৃত ধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে সর্বকালে আত্মপ্রকাশ করে থাকি।

গৌতম বুদ্ধ হযরত ঈসা (আ)-এর পাঁচশ বছর পূর্বে ইরান থেকে চীন পর্যন্ত ধর্ম প্রচার করেন। তাঁর মৃত্যুর মুহূর্ত উপস্থিত হলে তাঁর শিষ্য নন্দা কান্নার সুরে বলল: গুরু! আপনার বিদায়ের পর দুনিয়ার মানুষকে কে শিক্ষা দেবে? তখন বুদ্ধ বললেন:

> নন্দা! আমিই প্রথম বুদ্ধ নই যে দুনিয়ায় এসেছি, আমি শেষ বুদ্ধ ও নই।..... যথাসময়ে আর একজন বুদ্ধ দুনিয়ায় আসবেন। পবিত্র, শুভ্র, সমুজ্জ্বল হৃদয়, কাজে বুদ্ধিমত্তায় ভরপুর, বরকতসম্পন্ন বিশ্বলোকের মহাবিজ্ঞ, মানব জাতির সরদার। যে

অন্যান্য যে সত্যসমূহ আমি প্রকাশ করেছিলাম, তিনি তাও প্রকাশ করবেন। তিনি এক সর্বাঙ্গ ও প্রকৃত মহাসত্যের প্রচার করবেন। —গীতার, এলাহাবাদ, ৩য় অক্টোবর, ১৯৩৩

হযরত ঈসা (আ)-ও তাই করেছেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন : তিনি শেষ নবী নন, তাঁর পরে আরো একজন রাসূল আসবেন। তিনি দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার সময় বলেছিলেন :

আমি পিতার নিকটে যাইতেছি ও তোমরা আর আমাকে দেখিতে পাইতেছ না।...... তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে। কিন্তু তোমরা এখন সে সকল সহ্য করিতে পারিবে না। পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন, কারণ তিনি আপন হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন। (ধর্মপুস্তক, নতুন নিয়ম, ১৯২পৃষ্ঠা, যোহন ১০ হইতে ১৩-শ্লোক)

বনী ইসরাঈলের অন্যান্য নবীও এই ধরনের কথা বলেছেন, যা এখনও বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে। এ সব থেকে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী প্রায় সব ধর্ম প্রচারকই শেষ নবী ও রাসূলের আগমন সম্পর্কে আগাম সংবাদ দিয়ে গেছেন। এই শেষ নবীই হচ্ছেন হযরত মুহাম্মাদ (স)।

এবারে সর্বশেষ মানদণ্ডের পর্যায়ে কথা বলব। অর্থাৎ আমরা যাকে শেষ রাসূল বলছি, তাঁর উপস্থাপিত শিক্ষা ও বিধান কি সর্বতোভাবে অপরিবর্তিত ও অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান আছে?

এর জবাব সুস্পষ্ট। বলা যেতে পারে, নবী-রাসূল বলে যাদেরই উল্লেখ করা হোক, তাদের সকলের মধ্যে একমাত্র হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপস্থাপিত শিক্ষা তথা আল্লাহর কিতাবই সর্বতোভাবে ও সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্তিত ও অবিকৃত অবস্থায় এখন পর্যন্ত রয়েছে এবং চিরকালই তা এরূপই থাকবে বলে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। চৌদ্দশ বছর পূর্বে তিনি যে কুরআন আল্লাহর নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন, তা এখন পর্যন্ত ঠিক তেমনিই আছে যেমনটি পূর্বে ছিল; তাতে একটি শব্দ বা অক্ষরেরও পরিবর্তন হয়নি। তিনি এই কুরআনের ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে ও মানব জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রের কার্যাবলী সম্পর্কে যে সব কথা বলেছেন, তা ঠিক ঠিকভাবে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং সংরক্ষিত রয়েছে।

হযরত মুহাম্মাদ (স) যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর বহু-সহস্র সাহাবী ও মুসলমান কুরআনে হাফেয ছিলেন। তিনি দীন-ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিভিন্ন পর্যায়ে যা যা বলেছেন, তা যেমন তাঁদের কণ্ঠস্থ ছিল, তেমনি তাঁরাই তা দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে প্রচার করে গিয়েছেন। পরবর্তীকালে তা সংগৃহীত ও গ্রন্থাকারে

সংকলিত হয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত ও অম্লান হয়ে থাকবে এবং মানুষকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে নির্ভুল পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব পালন করতে থাকবে।

৫. মুহাম্মাদ (স)-এর পৌঁছিয়ে দেয়া আল্লাহ্‌র কিতাব এবং তাঁহার মুখ-নিঃসৃত বাণী ও তাঁর কার্যাবলীর বিবরণ যথাযথভাবে সুরক্ষিত থাকা মানবেতিহাসের এক বিস্ময়কর ঘটনা, তা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যেতে পারে না। কিন্তু তাঁর পূর্ববর্তী অন্য কোন নবীর নিয়ে আসা গ্রন্থ ও তাঁদের কথাসমূহ যথাযথ বর্তমান নেই বলে একথা বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলা যেতে পারে যে, আগের নবী-রাসূল ও ধর্ম প্রচারকগণ নিজ নিজ সময়ের লোকদের জন্য পথপ্রদর্শক থাকলেও তাঁদের জীবন অবসানের সাথে সাথে সে মর্যাদারও অবসান ঘটেছে। কিন্তু মুহাম্মাদ (স) যেদিন থেকে আল্লাহ্‌র নবী ও রাসূল হিসাবে বরিত হয়েছেন, সেদিন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এবং বর্তমান সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত তিনিই হচ্ছেন বিশ্বমানবের একমাত্র পথ-প্রদর্শক, জীবন সমুদ্রের কাণ্ডারী এবং ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে মানুষের একমাত্র অনুসরণীয় নেতা। কেননা তাঁর উপস্থাপিত আদর্শ কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত ও অবিকৃত থাকবে। যুগ-কাল ও স্থানের যত পরিবর্তনই সাধিত হোক, তাতে একবিন্দু পরিবর্তনেরও সম্ভাবনা নেই।

৬. হযরত মুহাম্মাদ (স) নিজেকে আল্লাহ্‌র নবী ও রাসূল হিসেবে উপস্থাপন করার সাথে সাথে তিনটি প্রাসঙ্গিক কথারও ঘোষণা দিয়েছেন ঃ

প্রথম, তিনি দুনিয়ার কোন জাতি বা জনগোষ্ঠির নবী ও রাসূল হিসেবে আসেন নি। তিনি দুনিয়ার সব মানুষের প্রতি প্রেরিত নবী ও রাসূল। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ يَـاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

বল, হে বিশ্ব-মানব! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূল।

(আ'রাফ ঃ ১৫৮)

দ্বিতীয়, তিনিই সর্বশেষ নবী ও রাসূল। কুরআন আল্লাহ্‌র সর্বশেষ কিতাব। তাঁর নবুয়্যাত ও রিসালাত কোন এক সময়, এক কাল ও এক যুগের জন্য নয়, বরং কিয়ামত পর্যন্তকার সকল মানুষের জন্য—সকল বংশের, বর্ণের, ভাষার, শ্রেণীর ও অঞ্চলের মানুষের জন্য। এ কথাই কুরআনে বলা হয়েছে নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ -

মুহাম্মাদ (স) তোমাদের পুরুষদের কোন একজনের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল ও সর্বশেষ নবী।

তৃতীয়, তাঁর নবুয়্যাত ও রিসালাত তাঁর পূর্বের সব নবীর নবুয়্যাত ও সব রাসূলের রিসালাত মনসুখ ও সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়েছে। অতপর অনুসরণীয় একটি মাত্র বিধান হচ্ছে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর শরীয়াত। একমাত্র এ পথেই মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি ও নিষ্কৃতি সম্ভব।

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ج وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ-

ইসলাম ছাড়া অন্য যে দীনই মানুষ পসন্দ করবে—চাইবে, তা তার নিকট থেকে কস্মিনকালেও গ্রহণ করা হবে না; বরং সে পরকালে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। (আল-ইমরান : ৮৫)

তিনি নিজের ভাষায় এ কথার ব্যাখ্যা করেন অনেক ভঙ্গিই করেছেন। একবার তিনি বলেছিলেন :

اُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِىَ النَّبِيُّوْنَ - (مسلم، ترمذى، ابن ماجه)

আমি সমগ্র সৃষ্টিকুলের প্রতি প্রেরিত। নবী আগমনের ধারা আমার দ্বারা খতম করে দেয়া হয়েছে।

مَنْ اَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصٰى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ - (بخارى)

যে লোক মুহাম্মাদকে মানল, অনুসরণ করল, সে আল্লাহকে মানল, অনুসরণ করল। যে লোক মুহাম্মাদকে অমান্য করল, সে আল্লাহকে আমান্য করল। মুহাম্মাদই মানুষের মধ্যে পার্থক্যকারী (অর্থাৎ তাঁকে মানলে মুক্তি, না মানলে জাহান্নামের শাস্তি)।

এ আলোচনার উপসংহারে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, হযরত মুহাম্মাদ (স)-ই সত্য নবী, সত্য রাসূল। বর্তমান দুনিয়ার মানুষের নিকট এটাই পরম ও চরম সত্য।

তাই মানুষ ইহকাল ও পরকালে নিজেদের কল্যাণ ও মুক্তি চাইলে একমাত্র তাঁকেই নবী ও রাসূল রূপে মেনে নিয়ে সর্বতোভাবে কেবলমাত্র তাঁকেই অনুসরণ ও অবলম্বন করতে হবে। অনুসরণীয় তিনি ছাড়া আর কেউ নেই।

ঐক্যের নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)

দুনিয়ার সব মানুষই একথা জানে এবং নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) তওহীদী আকীদার প্রচারক এবং তওহীদী জীবন-বিধানের প্রতিষ্ঠাতা নবী ও রাসূল ছিলেন। মূলত তিনি ছিলেন তওহীদী আকীদার মহান প্রচারক হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর যৌথ দো'আর ফসল। তাঁরা দু'জন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে কা'বা নির্মাণ করার পর মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেছিলেন ঃ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

হে আমাদের রব! তুমি এই মক্কা নগরের অধিবাসীদের নিকট তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠাও, যে তাদের সামনে তোমার আয়াত পাঠ ও উপস্থাপন করবে, তাদেরকে কিতাব শিক্ষা দেবে, হিকমত জানিয়ে দেবে এবং তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে। নিঃসন্দেহে তুমি বিজয়ী শক্তির অধিকারী, মহাবিজ্ঞানী।

(বাকারা ঃ ১২৯)

আর ইবরাহীম (আ) তওহীদের আকীদা তদানীন্তন ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও আরব উপদ্বীপ—এই বিশাল এলাকার জনগণের মধ্যেই ব্যাপকভাবে প্রচার করেছিলেন এবং মক্কায় কা'বা নির্মাণ করে সেই তওহীদী আকীদারই বাস্তব নিদর্শন স্থাপন করেছিলেন। তাঁরই দো'আর ফলে মক্কা নগরে অতপর যে মহানবীর আবির্ভাব ঘটেছিল, তিনি ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (স)। তাই তিনিও ইবরাহীম (আ)-এর সেই তওহীদী আকীদাই নতুনভাবে প্রচার করেছিলেন এবং লোকদেরকে আহ্বান জানিয়েছিলেন খালেস তওহীদী আকীদার প্রতি ঈমান আনার জন্য, সমস্ত মানুষকে সেই তওহীদী আকীদার ভিত্তিতে একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ করার জন্য, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানাদিকে সেই তওহীদী আকীদার ভিত্তিতে পুনর্গঠিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

তওহীদী আকীদার দার্শনিক ভিত্তি

বিশ্বলোকের চরম বিস্ময়োদ্দীপক রহস্য হচ্ছে একত্ব ও বহুত্বের বৈচিত্র্য। বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিশ্বচরাচরের চতুর্দিকে বিপুলতা ও বহুত্বের বৈচিত্র্য দৃষ্টিমানকেও অভিভূত ও বিভ্রান্ত করে। কিন্তু তার গভীর অভ্যন্তরে নিগূঢ় তত্ত্ব হিসেবে যে ঐক্য ও অভিন্নতা

বিরাজ করছে, তা সাধারণ মানুষের গোচরীভূত হয় না বলে তারা বহু সংখ্যক স্বতন্ত্র শক্তির স্বীকৃতি দিয়ে শিরক-এর পংকিলতায় নিমজ্জিত হয়। কিন্তু মহান আল্লাহ এই বাহ্যিক বহুত্বের রহস্যজাল ছিন্ন করে নবী-রাসূলরূপে মনোনীত ব্যক্তিগণকে অন্তর্নিহিত একত্বকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে দেন। আল্লাহ্র সেই নবী ও রাসূলগণ বৈচিত্র্যময় বস্তুজগতের অন্তরালে নিহিত প্রত্যক্ষ-করা একত্বের সত্যকে দুনিয়ার মানুষের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত ও তার সাথে গভীরভাবে পরিচিত করেন। ইবরাহীম (আ) এই অন্তর্নিহিত পরম সত্যের সাক্ষাত লাভ করেই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন ঃ

يٰقَوْمِ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ - اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ -

হে জনগণ! তোমরা যে শিরক-এর মধ্যে নিমজ্জিত, আমি তার সাথে সম্পর্কহীন, মুক্ত। আমি তো আমার পূর্ণ সত্তা সেই মহান স্রষ্টার উদ্দেশ্যে নিবদ্ধ করছি, যিনি নিজ শক্তিতে সমস্ত আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল অস্তিত্ব দান করেছেন। আমি সর্বদিক দিয়ে মুখ ফিরিয়ে কেবল তাঁরই অভিমুখী হয়েছি। অতপর আমি মুশরিকদের মধ্যে গণ্য নই। (আন'আম ঃ ৭৮ ও ৭৯)

আল্লাহর একত্ব প্রচারে হযরত মুহাম্মাদ (স)

হযরত মুহাম্মাদ (স) আরবদেশে আল্লাহর সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে যখন আত্মপ্রকাশ করেন, তখন সমগ্র পৃথিবীসহ আরব উপদ্বীপ এক কঠিন ও সর্বাত্মক শিরক-এ নিমজ্জিত ছিল। তারা আল্লাহকে অস্বীকার করত, তা নয়। অতিপ্রাকৃতিক সত্তা ও সৃষ্টিকর্তা হিসেবে তারা মোটামুটিভাবে আল্লাহ আছেন বলে স্বীকার করত; কিন্তু সেই আল্লাহর 'যাত' ও 'সিফাত'—মূল সত্তা ও তাঁর গুণাবলীতে অন্যকে শরীক করত। তারা জগতকে বহু স্বতন্ত্র শক্তির লীলাভূমি বলে মনে করত এবং সেই স্বতন্ত্র শক্তিগুলোকে মহাশক্তির অধিকারী মনে করে এবং তাদের প্রত্যেকেরই দয়া ও কল্যাণ লাভ এবং তাদের ক্ষতি থেকে বাঁচার চিন্তায় প্রত্যেকের পূজা-উপাসনা ও আরাধনা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের পূজা-উপাসনা করত। তারা সূর্য-চন্দ্র, তারকা-নক্ষত্র, পাহাড়-নদী-সমুদ্র, এমন কি ভয়ংকর জীব-জন্তুরও পূজা করত। সামাজিক জীবনে তারা অন্ধভাবে ও নির্বিচারে দাসত্ব করত ধর্মের এজেন্ট হয়ে দাঁড়ানো ব্যক্তিবর্গের, গোলামী করত সমাজপতিদের—নিঃশব্দে পালন করত রাজা-বাদশাহ ও রাষ্ট্রকর্তাদের জারি করা আইন-কানুন ও হুকুম-আহকাম।

মুহাম্মাদ (স) শুরু থেকেই এইসব শিরক-এর পংকিলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র ছিলেন। নবুয়্যাত লাভের পর তিনি জনগণকে এই শিরকী আকীদার ভুল-ভ্রান্তি বুঝিয়ে তাদেরকে খালেস তওহীদে—আল্লাহ্ এক ও লা-শরীক—এই আকীদায় বিশ্বাসী বানাবার জন্য চেষ্টা শুরু করেন। তিনি কুরআনের ভাষায় দাওয়াত পেশ করেন ঃ

তদানীন্তন দুনিয়ায় একই এলাকার বিভিন্ন গোত্রের, জাতির, বংশের খোদা ভিন্ন ভিন্ন ছিল—ভিন্ন ভিন্ন ছিল বিভিন্ন দেশের বর্ণের ও ভাষার লোকদের খোদা। হযরত মুহাম্মাদ (স) তওহীদী আকীদার যে ব্যাখ্যা পেশ করলেন, তাতে 'খোদা'র দিক দিয়ে মানুষে মানুষে এই পার্থক্য ও বিভিন্নতা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। তিনি জানালেন, সকল মানুষের 'খোদা' সেই এক আল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কারোরই কোন খোদা নেই। ফলে মানুষে মানুষে, গোত্রে-গোত্রে, শ্রেণীতে-শ্রেণীতে, বর্ণে-বর্ণে, বংশে-বংশে ও দেশে-দেশে পারস্পরিক যে পার্থক্য ও ভেদ-বৈষম্য ছিল, সব ভেঙে-চুরে একাকার হয়ে গেল। সব মানুষের খোদা হলেন এক আল্লাহ। তিনি ঘোষণা করলেন:

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَنّٰى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ -

আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সম্পূর্ণ নতুনভাবে অস্তিত্ব দানকারী তিনি। তাঁর সন্তান হবে কেমন করে? তাঁর তো কোন স্ত্রী নেই। সব জিনিস তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত। এই হচ্ছেন আল্লাহ, তোমাদের রব; তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। দুনিয়ায় অস্তিত্বশীল প্রতিটি জিনিসের তিনিই সৃষ্টিকর্তা। অতএব, তোমরা সকলে তাঁরই দাস হয়ে জীবন যাপন কর। সব জিনিসেরই দায়িত্বশীল তিনিই। (সূরা আন'আম : ১০১ ও ১০২)

এ আয়াতে জানিয়ে দেয়া হল:

—আসমান-জমিনের নতুন অস্তিত্বদানকারী যিনি, সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা যিনি, তিনিই তোমাদের ইলাহ।

—তিনি যেহেতু সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা, তাই তিনি কারোরই জন্মদাতা নন। তিনি কারো পিতা নন, কেউ তাঁর সন্তান নয়। তাঁর স্ত্রীও কেউ নয়, হতে পারে না।

—সর্ব বিষয়ের মৌলিক জ্ঞানের অধিকারী তিনিই।

—অতএব তিনিই তোমাদের রব, তোমার আনুগত্য ও দাসত্ব কেবলমাত্র তাঁরই জন্য নিবেদিত হবে।

—যিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি একা তিনিই হতে পারেন মা'বুদ বা উপাস্য। মা'বুদরূপে তাঁকেই গ্রহণ করা উচিত। অতএব, তোমরা নিজেদেরকে একমাত্র তাঁরই দাস এবং তাঁকেই তোমাদের একমাত্র মা'বুদ বা উপাস্য মেনে নাও।

সকলেই এক আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর নাযিল করা কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। আমরা আল্লাহ্র রাসূলগণের মধ্যে পারস্পরিক কোন পার্থক্য করি না। (বাকারা ঃ ২৮৫)

আল্লাহ্র পাঠানো কোন কোন নবী-রাসূলকে মানি আর কোন কোন নবী-রাসূলকে মানি না—এভাবে পার্থক্য করার নীতির প্রতিবাদ করেছেন হযরত মুহাম্মাদ (স)। তিনি বরং সকলকেই আল্লাহ্র বরহক নবী-রাসূল হিসেবে মানবার জন্য তাকীদ করেছেন। কোন নবী-রাসূলকে কেবল এক বংশের লোকেরা মানবে, অন্য বংশের লোকেরা মানবে না, এটা অত্যন্ত মারাত্মক ভুল কথা। সকলকেই আল্লাহ্র বরহক নবী ও রাসূল মানতে হবে। তবে একজন নবী বা রাসূলের চলে যাওয়ার পর আর একজন নবী বা রাসূল এলে আগের নবী বা রাসূলের শরীয়াতের পরিবর্তে নতুন নবী ও রাসূলের শরীয়াত মানতে হবে। কিন্তু দ্বীন সব নবীরই এক ও অভিন্ন থাকে বলে নবী বা রাসূল হিসেবে মানার ব্যাপারে কোন তারতম্য হবে না।

এটা ছিল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সর্বশেষ নবী-রাসূল হিসেবে আগমনের পূর্বের অবস্থা। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আগমনের পর অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে।

পূর্বে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সমাজে নবী-রাসূলগণ সম্পর্কে ধারণা কিছুমাত্র উন্নত ছিল না। তাদের বানানো গ্রন্থে নবী-রাসূলগণ সম্পর্কে অত্যন্ত খারাপ ধরনের কথাবার্তা লেখা রয়েছে।

কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁর উপস্থাপিত কুরআনে আল্লাহ্র নবী ও রাসূলগণের একটা উচ্চতর মর্যাদা ঘোষণা করা হয়েছে। মানব সমাজ থেকে তাঁরা আল্লাহ্র বাছাই-করা ও মনোনীত ব্যক্তি। তাঁরা আল্লাহ্র হিফাজত লাভ করেন; তাঁরা হন মাসুম বা নিষ্পাপ। মানুষকে আল্লাহ্র বিধান পৌঁছিয়ে দেন তাঁরা। আল্লাহ্র পথে চলার এবং তাঁর বন্দেগী কবুল করার দাওয়াত দেন এবং সেই পথে পরিচালিতও করেন তাঁরা। তাঁরা আল্লাহ্র নিকট থেকে ওহী লাভ করেন। তাঁরাই হন তাঁদের সময়ের সর্বোত্তম মানুষ।

কুরআনে নবী-রাসূলগণকে দুটি পর্যায়ে রাখা হয়েছে। এক পর্যায়ে তাঁরা, যাঁদের নাম কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁরা যাঁদের নাম কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি। ইরশাদ হয়েছে ঃ

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَٰتٍ –

এই রাসূলগণ। এদের কতককে আমরা অন্য কতকের ওপর অধিক মর্যাদা দিয়েছি। এদের মধ্যেই এমন রাসূলও রয়েছে, যাদের সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছেন এবং কতককে বহু উচ্চতর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। (বাকারা ঃ ২৫৩)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ –

নিঃসন্দেহে আমরা তোমার পূর্বে বহু সংখ্যক রাসূল পাঠিয়েছি। তাদের কিছু কিছু রাসূলের কথা তোমার নিকট বর্ণনা করেছি এবং এমনও বহু রয়েছে, যাদের কথা তোমার নিকট বর্ণনা করিনি। (মুমিনুন ঃ ৭৮)

এই মুসলমানদের জন্য আল্লাহ্র পাঠানো সব নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান আনা মুমিন হওয়ার জন্য জরুরী শর্ত হিসেবে গৃহীত। কোন নবীকে অবিশ্বাস করা সমস্ত নবীকে অবিশ্বাস করার শামিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কোন্ নবী কোথায় এসেছেন, কোন্ নবী কোন্ বংশের বা কোন্ সময়ের—এ প্রশ্নের কোন গুরুত্ব ইসলামে নেই। এ কারণে তাঁদের মধ্যে কোনরূপ তারতম্যও করা যাবে না।

আল্লাহ্র কিতাবসমূহের অভিন্নতা

আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে মানুষের কর্মবিধান হিসেবে বহু সংখ্যক কিতাব ও সহীফা নাযিল করেছেন; কিন্তু ইহুদীরা তওরাত ছাড়া আর কোন কিতাবকে আল্লাহ্র কিতাব মানতে রাজী ছিল না। খৃষ্টানরা তওরাত কিতাবের বিধানসমূহকে মানত না, যদিও তার নৈতিক শিক্ষাসমূহকে গুরুত্ব দিত। তবু ইনজীলের পূর্বে আল্লাহ্র যেসব কিতাব নাযিল হয়েছে, সেসব কিতাবের সম্মান ও মর্যাদা তারা স্বীকার করত না। পারসিকরা 'জিন্দাবেস্তা' ছাড়া অন্য কোন কিতাবকে আল্লাহ্র কালাম মানতে প্রস্তুত ছিল না। ভারতীয় ব্রাহ্মণেরা 'বেদ' ছাড়া অন্য কোন কিতাব খোদার নাযিল করা বলে বিশ্বাস করত না।

কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি যে কিতাব নাযিল হয়েছে, তাতে কুরআনকে আল্লাহ্র সর্বশেষ কিতাব হিসেবে মেনে নেয়ার সাথে সাথে কুরআনের পূর্বে যেসব কিতাব আল্লাহ্র নিকট থেকে এসেছে, সেসবকেও আল্লাহ্র কিতাব বলে বিশ্বাস করা মুমিন-মুত্তাকী হওয়ার শর্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ –

মুত্তাকী তারা, যারা তোমার প্রতি নাযিল হওয়া কিতাবের প্রতি ঈমান রাখে এবং ঈমান রাখে তোমার পূর্বে নাযিল হওয়া কিতাবসমূহের প্রতি। (বাকারা ঃ ৪)

মোটকথা, হযরত মুহাম্মাদ (স) কুরআনের ঘোষণানুযায়ী আল্লাহ্র নাযিল করা সব কিতাবকে একই উৎস থেকে আসা বলে ঘোষণা করেছেন। অন্য কথায়, প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হযরত আদম (আ) থেকে হযরত মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত নাযিল হওয়া সব কিতাব আল্লাহ্রই কিতাব এবং সব কিতাবে একই দীন-ইসলামকে পেশ করা হয়েছে। তাতে খুঁটিনাটি বিধান বিভিন্ন থাকলেও মূল দীন অভিন্নই রয়েছে।

দ্বীনের একত্ব

বাহ্যিক দৃষ্টিতে দুনিয়ায় প্রচলিত ধর্মসমূহকে ভিন্ন ভিন্ন ও পরস্পর-বিরোধী মনে করা হয়; এর কারণও রয়েছে। এ পর্যায়ে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ঘোষণা হচ্ছে, দ্বীন বা ধর্ম নামে দুনিয়ায় যা প্রচলিত রয়েছে সেসবের মূল কথা তওহীদ—আল্লাহ্ এক ও লা-শরীক। এই মৌল শিক্ষা নিয়েই তার শুরু, যদিও পরবর্তীতে তাতে অনেক বিভ্রান্তি ও বিকৃতি এসেছে। তবে আল্লাহ্র পাঠানো সব দ্বীনই মৌলিকভাবে অভিন্ন; আল্লাহ্র অস্তিত্ব, তাঁর একত্ব, তাঁর বিশেষ গুণাবলীর পূর্ণত্ব, নবী-রাসূল প্রেরণ, আল্লাহ্র ঐকান্তিক ইবাদত, মানুষের মর্যাদা ও অধিকার, ভালো ও মন্দ কাজের হিসেব দান—এসবই হচ্ছে আল্লাহ্র পাঠানো দ্বীনের মৌলিক কথা আর এ ব্যাপারে সব নবী-রাসূলের শিক্ষা অভিন্ন ও পার্থক্যহীন ছিল। এই মৌলিক কথাই সব নবী ও রাসূল প্রচার করেছেন। এক্ষেত্রে স্থান-কালের পার্থক্যের কোন প্রশ্ন নেই। জাতি-দেশ ও বংশ-বর্ণের বিভেদ তাতে কোনরূপ পার্থক্যের সৃষ্টি করেনি। পরবর্তীতে যদি কোন পার্থক্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে তা হয়েছে ব্যাখ্যার বিভিন্নতা কিংবা দ্বীনের দুশমনদের শয়তানী কারসাজির দরুন সৃষ্ট বিকৃতি সাধনের ফলে।

দ্বীনের মৌলিক ব্যাপারে অভিন্নতা থাকলেও শরীয়াত বা খুঁটিনাটি ব্যাপারে পার্থক্য রয়েছে। তা এক-এক নবীর সময় এক-এক রকম থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ইসলামের এই আকীদাটা নীতি হিসেবে গৃহীত যে ঃ

شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَّنَا مَالَمْ يَنْسَخْ عَلٰى لِسَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

আমাদের পূর্ববর্তী শরীয়াতও আমাদের জন্য শরীয়াত হিসেবে অবশ্যই পালনীয়। তবে তার কোনটি যদি রাসূলে করীম (স)-এর জবানীতে মনসুখ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা।

মনসুখ হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তা আমাদের জন্যও শরীয়াত এবং অবশ্যই পালন করতে হবে। দ্বীন-এর এই মৌলিক অভিন্নতাকে ভিত্তি করেই কুরআনের বাণী পেশ করে সেই মৌলিক একত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে হযরত মুহাম্মাদ (স) অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের দাওয়াত দিয়েছিলেন এই বলে ঃ

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّانَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَانُشْرِكَ بِشَيْئًا وَّلَايَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ -

বল, আল্লাহ্‌র নাযিল করা কিতাবসমূহের প্রতি ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আস এমন একটি বাণীর দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সর্বতোভাবে সমান। তা হচ্ছে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোরই ইবাদত করব না—কারোরই দাস হব না। তাঁর সাথে একবিন্দু শিরক করব না এবং আমরা পরস্পরকে রব বানাব না আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে।

আয়াতের নির্যাস হচ্ছে :

—এমন একটি বাণী বা কথা, যা মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অভিন্ন, তা গ্রহণ করে পারস্পরিক বিরোধ ও পার্থক্য শেষ করে দেয়া—সে কথাটির তিনটি অংশ :

১) আল্লাহ্ই আমাদের সকলের মা'বুদ বা উপাস্য, আমরা সকলে একমাত্র আল্লাহ্‌র বান্দা। আমরা সকলেই ইবাদত-বন্দেগী কেবলমাত্র এক আল্লাহ্‌র করব, আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোরই করব না।

২) সেই এক আল্লাহ্‌র সাথে আমরা এক বিন্দু জিনিসকেও—কোন ব্যক্তিকে ও শক্তিকেও শরীক করব না, শরীক হতে পারে বলে বিশ্বাসও করব না। ইবাদত ও আনুগত্য খালেসভাবে এক আল্লাহ্‌র জন্যই নির্দিষ্ট ও সংরক্ষিত রাখব।

৩) আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আমরা নিজেরাও পরস্পরকে, আমরা তোমাদেরকে বা তোমরা আমাদেরকে রব্ব—সার্বভৌম, আইন-বিধানদাতা ও মানবার যোগ্য বলে স্বীকারই করব না।

বস্তুত এই তিনটি কথা দ্বীনের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মৌলিক। দ্বীন-বিশ্বাসী ও দ্বীন পালনকারী যে কোন জনগোষ্ঠী এই তিনটি মৌলিক কথা মেনে নিলে কোন ধর্মীয় বিরোধ ও পার্থক্যের প্রশ্নই থাকবে না।

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপস্থাপিত 'দ্বীনের একত্ব' সংক্রান্ত ধারণা দুনিয়ার ধর্মীয় জনতাকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছে এবং প্রতিটি ভাগের আলাদা আলাদা অধিকার ও মর্যাদা নির্ধারণ করেছে; দুনিয়ায় তেরশ বছর পর্যন্ত তদনুযায়ী কাজও হয়েছে। সে চারটি ভাগ হচ্ছে : মুসলমান, আহলি কিতাব, প্রায় আহলি কিতাব এবং কাফির-মুশরিক। উক্ত ধারণা ও তার ভিত্তিতে তৈরী আইন-বিধান দুনিয়ার বুকে শান্তি ও মুসলমানদের মধ্যে ঔদার্যের সৃষ্টি করেছে। তাতে প্রতিটি ধর্মীয় গোষ্ঠী নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ও সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে অপরাপর জনগোষ্ঠীর সাথে মিলিত হয়ে এক দেশে ও এক শাসনের অধীনে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে; তাদের পরস্পরের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতাও চলতে পারে।

বিশ্বমানবতার ঐক্য

হযরত মুহাম্মাদ (স) ঘোষিত ঐক্য ও একত্বের সূচনা হয়েছে বিশ্বস্রষ্টা মহান

আল্লাহ্‌র একত্ব ও এককত্ব থেকে। এখানেই আল্লাহ্‌র বিরাটত্ব ও মহানত্ব নিহিত আর তার চরম পর্যায় হচ্ছে বিশ্বমানবতার ঐক্য ও অভিন্নতা।

—দুনিয়ার সমস্ত মানুষ এক আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। কোন মানুষই আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন শক্তির সৃষ্টি নয়।

—দুনিয়ার সব মানুষ একজন (প্রথম) মানুষের বংশধর। সব মানুষের দেহে সেই এক পিতার রক্ত প্রবাহিত।

—দুনিয়ার সব মানুষই আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ও মর্যাদাবান। কোন মানুষই অন্যান্য সৃষ্টি অপেক্ষা হীন নয়, নীচ নয়, মর্যাদাহীন নয়। দুনিয়ার সব কিছুই মানুষের সেবক, মানুষের কল্যাণে সর্বক্ষণ নিয়োজিত।

মানুষ হিসেবে দুনিয়ার সব মানুষই এই দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র 'খলীফা' মর্যাদায় অভিষিক্ত। 'খলীফা' হওয়ার অধিকারের দিক দিয়ে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই। তবে 'খলীফা' হওয়ার জন্য জরুরী গুণাবলী যে অর্জন করবে না, সে 'খলীফা'র মর্যাদা থেকে বিচ্যুত হবে।

হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্‌র কুরআনের ভিত্তিতে মানুষের ঐক্য ও অভিন্নতার পর্যায়ে এই মৌলিক কথাসমূহ ঘোষণা করেছেন। এর ফলে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের পূজা-উপাসনার লাঞ্ছনা থেকে চিরদিনের তরে মুক্তি পেয়েছে; মুক্তি পেয়েছে তারই মত অন্যান্য মানুষের গোলামী ও দাসত্বের লাঞ্ছনা থেকে—মানুষের পারস্পরিক ভেদ-বৈষম্যের নিষ্পেষণ ও নির্যাতন থেকে।

এক শ্রেণীর মানুষ নিজেদের ভিত্তিহীন গৌরব ও অহংকারের জোরে অভিন্ন ও অবিভাজ্য বিশ্বমানবকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করে রেখেছিল। সেই বিভক্তির কারণে মানুষের মর্যাদায়ও আসমান-জমিনের পার্থক্য সূচিত হয়েছিল। মানুষ হয়ে পড়েছিল তারই মত মানুষের নিকৃষ্ট দাসানুদাস। রাজা-বাদশাহ্‌রা তাদেরই মত কোটি কোটি মানুষকে বাধ্য করে রেখেছিল তাদেরকে সিজদা করতে, তাদের পায়ের তলায় স্থান নিতে। তাদের মুখের কথাই ছিল জনসাধারণের জন্য অবশ্য পালনীয় আইন। অর্থনৈতিক পার্থক্যের দরুন ধনী ও গরীবের মধ্যে আকাশ-ছোঁয়া পার্থক্যের সৃষ্টি করা হয়েছিল। বর্ণে-বর্ণে, দেশে দেশে ছিল হিংসা ও বিদ্বেষ। ভাষার পার্থক্যের কারণে মানুষে মানুষে পার্থক্যের পাহাড় রচিত হয়েছিল। এক দেশের মানুষ অন্য দেশের মানুষকে শত্রু মনে করত। এক বর্ণের ও বংশের মানুষ অন্য বর্ণের ও বংশের মানুষকে ঘৃণা করত। এক ভাষাভাষী মানুষ অন্য ভাষাভাষী মানুষকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও সম্পূর্ণ হীন মানুষ মনে করত; মনে করত, তারা মানুষ নয়, জঙ্গলের জীব।

হযরত মুহাম্মাদ (স) মানুষের মাঝে এই বিভেদ ও পার্থক্যের সমস্ত প্রাচীর চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে কুরআনের ভাষায় ঘোষণা করেছেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً -

হে মানুষ! তোমরা সকলে তোমাদের রব্ব-এর দাসত্ব কবুল কর। তোমাদের রব্ব তো তিনিই, যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁরই থেকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর স্ত্রীকে এবং এই দুজন থেকেই দুনিয়ার বুকে পুরুষ ও নারী রূপে বহু মানুষকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। (নিসা ঃ ১)

বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ -

হে মানুষ! আমরাই তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন মাত্র নারী থেকে সৃষ্টি করেছি (তোমাদের বংশধর হিসাবে)। তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি, বংশ ও গোত্রে বিভক্ত করেছি বটে, তা তোমাদের মাঝে বিভেদের প্রাচীর হিসেবে নয়, শুধু তোমাদের পারস্পরিক পরিচিতি লাভের উদ্দেশ্যে। তবে একটি দিক দিয়ে অবশ্যই পার্থক্য হবে। তা হচ্ছে তোমাদের মধ্যে যে লোক সবচাইতে বেশী আল্লাহ্-ভীরু, শরীয়াত পালনকারী, সে-ই তোমাদের সকলের অপেক্ষা আল্লাহ্র নিকট অধিকতর সম্মানার্হ। (হুযরাত ঃ ১৩)

এক আদম থেকে দুনিয়ার সব মানুষের জন্মগ্রহণ সংক্রান্ত ধারণা পূর্বে ইয়াহুদী ও ঈসায়ীদের মধ্যে একটি Cosmography বা সৃষ্টির গঠনতত্ত্ব পর্যায়ের ধারণা মাত্র ছিল। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (স) তার ভিত্তিতে সমগ্র মানবীয় একত্ব ও তজ্জনিত বিস্তারিত নৈতিক বিধান উপস্থাপন করেছেন। তিনি নিজের ভাষায় বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اَذْهَبَ مِنْكُمْ عَصَبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَكُمْ بِالْاٰبَاءِ اَلَا كُلُّكُمْ بَنُوْا اٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ -

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের থেকে জাহিলী যুগের অন্ধ আত্মম্ভরিতাজনিত বিদ্বেষ ও পূর্ব বংশ নিয়ে গৌরব অহংকার দূর করে দিয়েছেন। জেনে রাখবে, তোমরা সকলেই এক আদমের বংশধর আর আদমকে তো সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে।

আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সব মানুষ সে আদমের সন্তান। অতএব,

সকল মানুষই মাটির তৈরী। কাজেই কোন মানুষই নিতান্ত বংশগত দিক দিয়ে অন্য মানুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বা অধিক মর্যাদাবান হওয়ার এক বিন্দু দাবি করার অধিকারী নয়। সব মানুষই সমান। অতএব ঃ

لَافَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰى عَجَمِيٍّ وَّلَالِعَجَمِيٍّ عَلٰى عَرَبِيٍّ وَّلَالِاَسْوَدَ عَلٰى اَحْمَرَ وَّلَالِاَحْمَرَ عَلٰى اَسْوَدَ وَلَالِاَسْوَدَ عَلٰى اَبْيَضَ وَلَا لِاَبْيَضَ عَلٰى اَسْوَدَ –

আরবরা অনারবদের ওপরে শ্রেষ্ঠ নয়, অধিক মর্যাদাবাম নয় অনারবরা আরবদের ওপর। কৃষ্ণাঙ্গদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই শ্বেতাঙ্গ বা লাল রং বিশিষ্টদের ওপর। অনুরূপভাবে শ্বেতাঙ্গ বা লাল রং বিশিষ্টদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর।

এ পর্যায়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা হচ্ছে ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَايَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ –

হে ঈমানদার লোকেরা! কোন জনগোষ্ঠীই যেন অপর কোন জনগোষ্ঠীকে ঠাট্টা ও বিদ্রূপের শিকার না বানায়। কোন মেয়েলোকই যেন ঠাট্টা ও বিদ্রূপের পাত্রী না বানায় অন্য মেয়েলোকদেরকে। কেননা সে জনগোষ্ঠী প্রথমোক্তদের চেয়ে অনেক ভালো হতে পারে—অনেক ভালো হতে পারে সেই মেয়েলোকেরাও।

(হুজরাত ঃ ১১)

বলেছেন ঃ

لَاتَحَاسَدُوْا وَلَاتَبَاغَضُوْا وَكُوْنُوْ عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا –

তোমরা পরস্পরকে হিংসা করবে না, পরস্পরের প্রতি আক্রোশ ও শত্রুতা পোষণ করবে না; বরং তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র বান্দা ও ভাই-ভাই হয়ে থাক।

এ হচ্ছে মানবীয় ঐক্য ও একত্বের মৌলিক তত্ত্ব এবং পরস্পরে মিলেমিশে এক হয়ে থাকার উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষিত বাণী। এই বাণী মুসলমানে মুসলমানে এক ও অভিন্ন হয়ে, পারস্পরিক বিভেদ ও হিংসা-বিদ্বেষ মুক্ত হয়ে থাকার আমোঘ বাণী। এ সব বাণী শাশ্বত, মহামূল্য। এ রকমের বাণী দুনিয়ার কোন মনীষী, চিন্তাবিদ, দার্শনিক বা রাষ্ট্র-প্রধানের কণ্ঠে আজ পর্যন্ত উচ্চারিত হয়নি।

হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (স) এই অমূল্য ও অপূর্ব বাণীসমূহ নীতিকথা হিসেবে শুধু মৌখিক প্রচার করেই ক্ষান্ত থাকেন নি; বরং তিনি এই বাণীসমূহকে পুরাপুরি

বাস্তবায়িতও করেছেন। তদানীন্তন আরব উপদ্বীপের লোকদের চরিত্র ছিল অত্যন্ত হিংস্র। তারা পরস্পরের হিংসা-বিদ্বেষ ও মারামারি-কাটাকাটিতে লিপ্ত ছিল সাংঘাতিকভাবে। গোত্রে গোত্রে যে বিবাদের সৃষ্টি হত, তা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পরিণতি লাভ করত এবং সে যুদ্ধ চলত বংশের পর বংশ এবং বছরের পর বছর ধরে। অনেক ক্ষেত্রে তার ধারাবাহিকতা শত বছরও ছাড়িয়ে যেত। আর তাতে আত্মাহুতি দিত হাজার হাজার নারী-পুরুষ-বৃদ্ধ-শিশু-যুবক। হযরত মুহাম্মাদ (স) তওহীদী দাওয়াতের ভিত্তিতে প্রথমে এক আল্লাহ্‌র প্রতি সুদৃঢ় ঈমানে তাদেরকে ভূষিত করেন। এই ঈমানই তাদেরকে মানুষের একত্বের প্রতি বিশ্বাসী বানায়। সব মানুষই যে এক আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বান্দাহ, 'খলীফা'র আসনে সব মানুষ সমান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত এবং মানুষের জীবন, ধন-মাল ও মান-সম্মান রক্ষা করাই মানুষের কর্তব্য, এই মৌল তত্ত্বের প্রতি তারা শুধু বিশ্বাসীই হয় না, তারা এর ধারক, বাহক ও নিশানবরদারও হয়ে উঠে। ফলে তারা আর পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন থাকে না, তারা হয় একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি। আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اِنَّ هٰذِهٖ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنَ –

নিশ্চয়ই তোমাদের এই উম্মত এক ও অভিন্ন উম্মত আর আমিই তোমাদের রব্ব; অতএব, তোমরা আমাকেই ভয় কর। (আল-মুমিনুন ঃ ৫২)

اِنَّ هٰذِهٖ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنَ –

নিঃসন্দেহে তোমাদের এই জনগোষ্ঠী এক ঐক্যবদ্ধ জাতি আর আমিই তোমাদের রব্ব; অতএব, তোমরা কেবল আমারই দাস হয়ে থাক।

এটা সম্পূর্ণ বাস্তব হয়ে দেখা দেয় যে, সমগ্র আরব উপদ্বীপের মানুষ একমাত্র আল্লাহ্‌কে ভয় করে, একমাত্র তাঁকেই প্রভু (রব্ব) রূপে মেনে নিয়ে, একমাত্র তাঁরই বান্দা হয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে এক ঐক্যবদ্ধ জাতি হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরাই তওহীদী ঈমানের দাওয়াত তদানীন্তন এশিয়া ও আফ্রিকার বিশাল জনপদে বিস্তার করেন এবং এক ঐক্যবদ্ধ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। বিগত প্রায় দেড় হাজার বছরের ইতিহাস সম্মুখে রাখলে বোঝা যায়, একটি বালুকণা কি করে এক বিশাল আলোকস্তম্ভে পরিণত হয়ে উঠে মাত্র ৫০-৬০ বছরের মধ্যে এবং কি করে পৃথিবীর এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে শির্‌কের জুলমাতকে দূর করে দিয়ে তওহীদী ঈমানের আলোকে সমুদ্ভাসিত করে তোলে এই তওহীদী চেতনা-ভিত্তিক ঐক্যের বলে। কয়েক শতাব্দীকাল পর্যন্ত সে আলোকস্তম্ভ থেকে তওহীদের আলো বিচ্ছুরিত হতে থাকে পৃথিবীর দিকে দিকে। এই সময় বিশাল এলাকার মানুষ একটি অভিন্ন রাষ্ট্র ও প্রশাসনের অধীন ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করে। মানুষ বেঁচে থেকে ধন্য হয়।

কিন্তু সে ইতিহাস এই নির্মম সত্যকেও আমাদের সামনে তুলে ধরে যে, পরবর্তীকালে সেই পূর্ণাঙ্গ তওহীদী ঈমান হারিয়ে মুসলিম জাতি তেলহীন প্রদীপের মত

ক্রমে ক্রমে নিভে যেতে থাকে। মুসলিমগণ ভৌগোলিক, ভাষাভিত্তিক, বংশভিত্তিক নানা কুফরী জাতীয়তার ভিত্তিতে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ঐক্যবদ্ধ জাতি হয়ে পড়ে শতধাবিভক্ত। শুধু তা-ই নয়, বর্তমানে সেই ভৌগোলিক ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার জাহিলিয়াত মুসলমানদেরকে পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত করেছে এবং পরিণামে মুসলিম জনতার রক্তপাত হচ্ছে। অথচ রাসূলে করীম (স) এর হাদীস ঃ

قِتَالُ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فِسْقٌ وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ –

মুমিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কুফরী, তাকে গালমন্দ বলা ফাসিকী (ইসলামের সীমালংঘন) এবং তার ধন-মাল তার রক্তের মতই হারাম—সম্মানার্হ।

আজও এ প্রশ্ন তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে যে, মুসলমানরা কি তওহীদী আকীদা ত্যাগ করেছে? ত্যাগ করেছে কি মুসলমানদের একত্ব ও অভিন্নতা? তা না হলে একটি বিশেষ ভাষাভাষী মুসলিম নামধারী জনতা কি করে ভিন্ন ভাষাভাষী ইসলামী জনতার ওপর নির্বিচার হামলা চালাতে পারে? একটি বৃহৎশক্তি কিভাবে পার্শ্ববর্তী একটি মুসলিম দেশের নিরস্ত্র জনতার ওপর নানাবিধ আগ্নেয়াস্ত্র ও বিষাক্ত বোমা নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে এবং প্রায় ৪৫ টি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র থাকা সত্ত্বেও সে দেশের মুসলমানদেরকে রক্ষা করার জন্য কার্যত কোন দেশই এগিয়ে আসছে না?

এই প্রশ্ন আজ সর্বত্র মুসলিম জনতার কণ্ঠে উচ্চৈস্বরে ধ্বনিত হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

বস্তুত আমরা যদি সত্যিকারভাবে তওহীদী আকীদায় বিশ্বাসী হয়ে থাকি, তাহলে আজকের মুসলিম জনতাকে সচেতন হতে হবে। যে তওহীদী ঈমান একদা আমাদেরকে দুনিয়ার সেরা জনগোষ্ঠীতে পরিণত করেছিল, সেই নির্ভেজাল তওহীদী ঈমান আবার আমাদের মনে-মগজে দৃঢ়মূল করে বসাতে হবে। তারই ভিত্তিতে আমাদের জীবন-সমাজ ও রাষ্ট্রকে পুনর্গঠিত করতে হবে। সেজন্য নির্মূল করতে হবে সর্বগ্রাসী জাহিলিয়াতকে। রাসূলে করীম (স) নির্দেশিত পদ্ধতিতে আমাদের সচেতন হয়ে ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে হবে নিজেদেরকে এবং প্রতিটি মুসলিম দেশে সচেতন ইসলামী জনতার ঐক্যবদ্ধ অভ্যুত্থান ঘটাতে হবে।

এ প্রসঙ্গে শেষ কথা হচ্ছে, আমরা যদি প্রকৃত মুসলিম হয়ে জীবন যাপন করতে চাই, যদি প্রকৃত মুসলিম রূপে দেখতে চাই আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদেরকে, তাহলে অনতিবিলম্বে সারা মুসলিম জাহানে ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের জন্য ইসলামী জনতার অভ্যুত্থান ঘটানো ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বিশ্বনবীর পূর্ণাঙ্গ আদর্শ

হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্‌র সর্বশেষ নবী ও রাসূল। দুনিয়ার মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাপনের পদ্ধতি হিসেবে আল্লাহ যে বিধান তাঁর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন, তা যেমন পূর্ণাঙ্গ, তেমনি তা শাশ্বত ও চিরন্তন। মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য কি রকমের আইন-বিধানের প্রয়োজন, তা মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌ ভালো করেই জানতেন। তাঁর এই জানা কোন চিন্তা-গবেষণার ফসল নয়—নয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের ফসল। কেননা তাঁর জ্ঞান যেমন অসীম ও অনন্ত, তেমনি তা স্বতঃস্ফূর্ত শাশ্বত ও প্রত্যক্ষ। তাই মানব জীবনের জন্য যে পূর্ণাঙ্গ বিধান তিনি নাযিল করেছেন সর্বশেষ নবীর মাধ্যমে, তা যেমন পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ, তেমনি মানব প্রকৃতির চাহিদার সাথে পূর্ণ মাত্রায় সামঞ্জস্যশীল।

মানুষকে এই দুনিয়ায় সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করতে হয়। কোন মানুষই নিঃসঙ্গ একক জীবন যাপন করতে পারে না। তাই আল্লাহ তা'আলা যে বিধান পাঠিয়েছেন, তা নিছক ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও নিতান্ত ধর্ম পর্যায়েরই নয়; তা ব্যক্তিকে যেমন পূর্ণাঙ্গ জীবনাচরণ বিধি প্রদান করে, তেমনি প্রদান করে ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সমাজের সামষ্টিক পর্যায়ের রীতিনীতি ও বিধান। এই দুই পর্যায়ের মাধ্যে পূর্ণ ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে সেই বিধানে।

দুনিয়ায় মানুষের কল্পিত সমাজ ব্যবস্থা অনেক রয়েছে। কোন কোনটির ভিত্তিতে সমাজ গঠিতও হয়েছে; কিন্তু তাতে এই প্রয়োজনীয় ভারসাম্য সম্পূর্ণ অনুপস্থিত বললেও অত্যুক্তি হবে না। কোন কোন সমাজ বিধানে ব্যক্তির ওপর অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যার দরুন এই ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে গঠিত সমাজ সে গরুত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে। ফলে ব্যক্তির প্রাধান্যপূর্ণ এই সামাজিক ব্যবস্থা সাংঘাতিকভাবে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রচণ্ডরূপ পরিগ্রহ করে স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতায় পর্যবসিত হওয়ায় সমাজ ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। ফলে এই সমাজ ব্যক্তিগণের আশ্রয়স্থল হওয়ার যোগ্যতা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে।

পক্ষান্তরে কোন কোন সমাজে ব্যক্তি হয়েছে চরমভাবে উপেক্ষিত। সমাজ-সমষ্টিই সেখানে সর্বাত্মক ও সর্বগ্রাসী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজ-স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্যক্তি-স্বার্থকে শুধু জলাঞ্জলিই দেয়া হয়নি, ব্যক্তিরা সমাজ-স্বার্থের বেদীমূলে আত্মাহুতি দিতেও বাধ্য হয়েছে। ব্যক্তিরা হয়েছে সমাজ-সমষ্টির দাসানুদাস। ব্যক্তিরা শেষ হয়ে যাক, সমাজ-সমষ্টির সেজন্য কোন ভাবনা-চিন্তা বা দায়-দায়িত্ব নেই। সমাজ-সমষ্টি ব্যক্তিদের

দুঃখ-দুর্দশা দূর করার দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত নয়; বরং এ সামাজিকতা-সামষ্টিকতাই ব্যক্তিদের ওপর দুর্বহ বোঝা ও জগদ্দল পাথর হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যক্তিদেরকে সমাজ শৃঙ্খলে এমনভাবে বন্দী করে ফেলা হয়েছে যে, সেখানে ব্যক্তিরা সমাজ-সমষ্টির বিরুদ্ধে 'টু' শব্দ করারও অধিকার রাখে না। সমাজ-সমষ্টির সকল অত্যাচার, জুলুম-নিষ্পেষণ ব্যক্তিদেরকে নীরবে সহ্য করতে হয়, তার বিরুদ্ধে ফরিয়াদ জানাবারও কোন স্থান নেই; বরং কোনরূপ ফরিয়াদ জানাবার ইচ্ছাও তার জীবনের চির অবসানের কারণ হয়ে দাঁড়ানই স্বাভাবিক এবং তা-ই হয়ে থাকে। কেননা সেখানে সমাজ-সমষ্টিই যেহেতু প্রধান, তাই সমাজের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করার অর্থ সমাজদ্রোহিতা আর সমাজ-প্রাধান্যের সমাজে সমাজদ্রোহিতা হচ্ছে সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধ। এ অপরাধ ক্ষমারও অযোগ্য।

এ প্রেক্ষিতে একথা বলার প্রয়োজন পড়ে না যে, এরূপ সমাজে মানুষের জীবন ঠিক মানুষের মত যাপিত হওয়া সম্ভবপর হয় না। সেখানে মানুষগুলোকে ঠিক পশুকুলের অবস্থায়ই জীবন যাপন করতে হয়। আর পশুকুলের অবস্থাতো এ-ই হয় যে, মানুষ তাদেরকে নিজ কাজে ব্যবহার করে আগলে নিয়ে গলায় রশি দিয়ে বেঁধে রাখে এবং সামনে যতটা ইচ্ছা খাবার ফেলে দেয়। সামনে রাখা সেই খাবারটুকু খেয়েই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। পশুরা ফরিয়াদ করলেও তার ভাষা বুঝতে চাওয়া হয় না, বুঝলেও তাকে উপেক্ষা করতে একবিন্দু দ্বিধা করা হয় না।

সমাজ-প্রাধান্যমূলক সমাজে গোটা সাধারণ মানুষের অবস্থা ঠিক এ রকমেরই হয়ে থাকে। সেখানে সমাজপতিরাই সর্ববিষয়ে প্রাধান্য পেয়ে থাকে এবং এই সমাজপতিদের উচ্চে যে ব্যক্তি আসীন থাকে, সে-ই হয় এ সমাজের সমস্ত মানুষের সর্বেসর্বা—খোদা। তার মর্জীই হয় সে সমাজের একমাত্র নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রক।

এখানে যে দুই ধরনের সমাজের পরিচিতি দেয়া হল তার একটি হচ্ছে পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র আর শেষেরটি হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র।

গণতান্ত্রিক সমাজ একটা প্রচণ্ড ধোঁকা ও প্রতারণাময় সমাজ। সেখানে সব মানুষের সমান অধিকারের কথা বলা হয়, মানবীয় অধিকার ও কর্তৃত্বের দোহাই দেয়া হয়; কিন্তু কার্যত মুষ্টিমেয় লোকদেরই চরম মাত্রার প্রাধান্য সেখানে সবকিছুর ওপর প্রবল হয়ে দেখা দেয়। সাধারণ মানুষের কাঁধে পা রেখে তারা উচ্চ হতেও উচ্চস্তরে উঠে যায়।

বলা হয়—সামাজিক মর্যাদা ও যাবতীয় কাজের কর্তৃত্বে সাধারণ মানুষই প্রধান। সকলের সামাজিক মর্যাদা যেমন অভিন্ন, তেমনি সামাজিক কর্তৃত্বলাভের অধিকার ও সুযোগ সকলেরই জন্য সমানভাবে অবারিত। কিন্তু কার্যত সমাজের চালাক-চতুর-কুশলী কূটনীতিকরাই সেখানে সব সুযোগ-সুবিধা একচেটিয়াভাবে দখল করে নেয়। সাধারণ জনগণকে ধোঁকা দিয়ে, তাদের ভোট বাগিয়ে নিয়ে কিংবা জনগণকে ভোট দেয়ার অধিকার না দিয়ে নিজেদের 'মাস্তান' বাহিনীর দ্বারা ভোট নেয়ার ভান করে, কুশলী

প্রতাপশালীরা সামাজিক প্রাধান্য ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দখল করে বসে। অতপর তারা সেই বঞ্চিত জনগণেরই দোহাই দিয়ে তাদেরই নামে নিজেদের ইচ্ছামত সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করে। এভাবে সাধারণ জনগণ নির্মমভাবে প্রতারিত হয়। অবশ্য সেখানে ফরিয়াদ জানাবার কিছু সুযোগ থাকে বটে; কিন্তু সে সুযোগও সকলে ভোগ করতে পারে না নিজেদের অক্ষমতা ও অসহায়তার কারণে। আর এই অক্ষমতা ও অসহায়তা দূর করার নামে সেখানে কর্তৃত্বশীলদের সুযোগ-সুবিধার মাত্রা আরও অধিক বৃদ্ধি করে নেয়া হয়। ফলে জনগণ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে যেতে বাধ্য হয়।

বস্তুত এরূপ সমাজে গণতন্ত্রের দোহাই দিয়েই এক ধরনের স্বৈরতন্ত্র চালানো হয়। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার উদ্ধারের আন্দোলনকে সেই গণতন্ত্রেরই দোহাই দিয়ে পূর্ণ সরকারী শক্তি ব্যবহার করে দমিয়ে দেয়া হয়। গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হয়।

এই সমাজে ধন-সম্পদ উপার্জনের অধিকার সকলেরই সমানভাবে স্বীকৃত থাকে বটে, কিন্তু তার সুযোগ সকলের সমান থাকে না। ফলে বহু লোকই ধন-সম্পদ উপার্জন থেকে বঞ্চিত থেকে দারিদ্রের নিম্নতম অংশে পড়ে যায়। আর চালাক-চতুর ধূর্ত লোকেরা ধন-সম্পদ উপার্জনের অবাধ সুযোগ পেয়ে সমাজের বেশীর ভাগ সম্পদ করায়ত্ত করে নেয়। তা ব্যয়-ব্যবহার ও ভোগ করার একচেটিয়া অধিকার কেবল তাদেরই থাকে। অন্যরা—সাধারণ মানুষ—প্রাণ বাঁচাবার প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ আহরণ থেকেও বঞ্চিত থাকতে বাধ্য হয়।

এ সমাজকেই বলা হয় পুঁজিবাদী সমাজ। এখানে পুঁজির মালিক যারা হয়, তাদের প্রভাবাধীন থাকে সব সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এমন কি রাষ্ট্রও তাদের ইশারা-ইঙ্গিতে চলতে বাধ্য হয়। এখানে ধন-সম্পদের মালিক হয় মুষ্টিমেয় লোক। তারা রাষ্ট্র সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার করে নিজেদের স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধার অনুকূলে তাকে চালাতে চেষ্টা করে। জনগণ সেখানে হয়তবা ভোট দেয়ার সুযোগ পায়; কিন্তু ভোট পর্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পর তারা চরমভাবে উপেক্ষিত হয়েই থাকে।

পক্ষান্তরে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও ধন-সম্পদের মালিকত্ব নিরংকুশভাবে ভোগ করে একটিমাত্র সরকারী পার্টি ও সরকার পরিচালকরা। সেখানে শীর্ষস্থানে বসে থাকা ব্যক্তি হয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় শক্তির একচ্ছত্র মালিক। এখানে ব্যক্তির কোন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার এতটুকুও স্বীকৃত নয়।

এই উভয় সমাজ ও রাষ্ট্র সর্বতোভাবে আল্লাহদ্রোহী। গণতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে আল্লাহ্কে প্রাকৃতিক জগতের কর্তা ও স্রষ্টা হিসেবে মেনে নিলেও বাস্তবে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে তাঁকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করা হয়। বলা হয়, খোদা বলতে কেউ থেকে থাকলে

প্রাকৃতিক জগতের ওপর কর্তৃত্ব চালিয়েই তিনি যেন সন্তুষ্ট থাকেন। আমাদের মানব সমাজে ও রাষ্ট্রে তাকে আসতে হবে না—আসতে দেয়া হবে না। মানব সমাজের ওপর কর্তৃত্ব আমরা মানুষরাই চালাব। আমরাই মানুষের জন্য আইন রচনা করব। জনগণ তা মেনে চলতে বাধ্য হবে। এই মেনে নেয়াটাই তাদের কাজ। আল্লাহকে তারা যদি মানেই তবে সে মান্যতাটা নিছক ধর্মীয় ক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। সমাজ-রাষ্ট্র-শিক্ষা-সংস্কৃতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে আল্লাহর কোন আইন-বিধান চলবে না।

এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এই দুটি ব্যবস্থার কোনটিই মানুষের উপযোগী নয়। মানুষের মর্যাদা ও অধিকারের দিক দিয়ে এ দুটিই অত্যন্ত মারাত্মক। দুটিতেই মানুষ বঞ্চিত, শোষিত, নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, পদদলিত।

অথচ মানুষ হচ্ছে এই পৃথিবীতে সেরা সৃষ্টি; সর্বাধিক মর্যাদাবান প্রজাতি। এহেন মানুষের জন্য সেই জীবন-বিধানই গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যাতে তার এই মর্যাদা স্বীকৃত হবে; মানুষের মানুষ হিসেবে মর্যাদাসহ জীবন যাপনের অধিকার, সুযোগ ও ব্যবস্থা কার্যকর থাকবে। যাতে তা নেই, তা মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না; তা মানুষকে সামান্য বৈষয়িক সুখ-শান্তিও দিতে পারে না।

এরূপ একটি জীবন ব্যবস্থা রচনা তাঁর পক্ষেই সম্ভব, যিনি মানুষকে এই মর্যাদাসহ সৃষ্টি করেছেন। মানুষ যেহেতু মানুষকে সৃষ্টি করেনি, তাই কোন মানুষের রচিত জীবন-বিধান মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়।

মানুষ প্রথমে একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা। সেই স্বতন্ত্র সত্তাসমূহের সমন্বয়েই গড়ে উঠে সমাজ। সমাজও মানুষের জন্য অপরিহার্য, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যক্তিসত্তাকে অস্বীকার করা হয় যে সমাজ ব্যবস্থায়—তার স্বাতন্ত্র্য, মর্যাদা ও অধিকার বিনষ্ট করা হয় যে সমাজে, সে সমাজ মানুষের জন্য নয়। তাই এ দুটির মধ্যে পূর্ণ সমন্বয় ও ভারসাম্য স্থাপন করা হয় যে আদর্শের ভিত্তিতে সে আদর্শই মানুষের জন্য প্রয়োজন, তা-ই গ্রহণযোগ্য। তাতে ব্যক্তিও স্বীকৃত হবে, সমাজও স্বীকৃত হবে। ব্যক্তির অধিকার স্বীকৃত হবে সমাজের ওপর, সমাজেরও অধিকার স্বীকৃত হবে ব্যক্তির নিকট। এহেন সমাজ ব্যবস্থাই হতে পারে মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা। এরূপ ব্যবস্থায় মানুষের সমগ্র দিক সম্পর্কে বিধি-বিধান থাকবে, কোন একটি দিককেও তাতে বাদ দেয়া হবে না।

মানুষের সত্তা দুটি দিকের সমন্বয়ে গঠিত। একটি তার দেহ, অপরটি তার রূহ্ বা আত্মা। এর কোন একটিকে বাদ দিয়ে মানুষের সত্তা চিন্তা করা যায় না। এ দুটিরই ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা রয়েছে। রূহের চাহিদা যেখান থেকে সে (রূহ) এসেছে তার দিকে। তিনি আল্লাহ্। আর দেহ রচিত হয়েছে মাটির মৌল উপাদান থেকে। তাই দেহের চাহিদা বস্তুগত। যে জীবন-বিধান এই উভয় দিকের চাহিদা পূর্ণ ভারসাম্য সহকারে একই মৌল ধারণাবিন্দুর দৃষ্টিতে পরিপূরণের ব্যবস্থা করতে পারে, তা-ই মানুষের জীবনকে প্রকৃত কল্যাণের সন্ধান দিয়ে ধন্য করতে পারে।

মানুষের ইহজীবন যেমন বাস্তব, তেমনি পরকালীন জীবনও। মৃত্যু এই দুটি জীবনের—জীবনের এই দুটি পর্যায়ের মাঝে সেতুবন্ধন। তাই যে জীবন-বিধান কেবল একটি পর্যায়ের চাহিদা পূরণে সচেষ্ট, অপরটির প্রতি দেখায় উপেক্ষা, তা মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য জীবন-বিধান হতে পারে না। যেমন কতকগুলো ধর্মমত এমন রয়েছে, যা মানুষের বৈষয়িক জীবনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে; মানুষকে এই জগতের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও শুধু আত্মিক বা আধ্যাত্মিক জীবনের পথ দেখায়। অনুরূপভাবে মানুষের মনগড়া কতকগুলো আধুনিক মতাদর্শ রয়েছে, যা মানুষের রূহ্ বা আত্মাকে মোটেই স্বীকার করে না, তা কেবল দৈহিক চাহিদা পূরণের ওপরই গুরুত্ব আরোপ করে। গণতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক জীবন-বিধান এই পর্যায়ের; তাই এর একটিও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, তা মানুষের জীবনে সার্বিক কোন কল্যাণও বয়ে আনতে পারে না।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সর্বশেষ নবী ও রাসূলের মাধ্যমে এক পূর্ণাঙ্গ ও পুরাপুরি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন-বিধান নাযিল করেছেন। সেই জীবন-বিধানেরই নাম 'আল-ইসলাম'। আল্লাহ্ নিজেই ঘোষণা করেছেন ঃ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ –

মানুষের জীবন যাপনের বিধান হিসেবে আল্লাহ্র নিকট গৃহীত কেবল সেই বিধান যার নাম 'আল-ইসলাম'।

'ইসলাম' মানে আত্মসমর্পণ আর 'আল-ইসলাম' মানে আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ। আল্লাহ্ই যেহেতু সমগ্র বিশ্বলোক ও মানুষের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, তাই মানুষের এই জীবনটা সম্পূর্ণ ও সর্বতোভাবে আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পিত হয়ে যাপিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সেরূপ জীবন যাপন আল্লাহ্র দেয়া জীবন-বিধান 'আল-ইসলাম' অনুযায়ীই হওয়া সম্ভব।

ইসলামে মানুষের রূহ্ বা আত্মার দিকে যেমন পূর্ণ নজর রাখা হয়েছে তেমনি তার বস্তুগত ও বৈষয়িক জীবনের প্রতিও সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কোনটির চাহিদাই তাতে বিন্দুমাত্র উপেক্ষিত হয়নি। উভয় দিকের প্রতি সমান গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে তাতে পূর্ণ ভারসাম্য স্থাপন করা হয়েছে। তাই ইসলামে যেমন আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে খালেস ইবাদতের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তেমনি বৈষয়িক জীবনকে সুষ্ঠুরূপে গড়ে তোলার জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বিধি-বিধানও পুরাপুরি দেয়া হয়েছে। আর এই সবের মূলে কেন্দ্রবিন্দুরূপে রয়েছে এই বিশ্বাস যে, আল্লাহ্রই নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব সমগ্র বিশ্ব ও তাঁর অনু-পরমাণুর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। তাঁরই বিধান সর্বাত্মকভাবে কার্যকর সমগ্র বিশ্বলোকের ওপর; অতএব সমগ্র মানব জীবনের ওপরও কার্যকর হতে হবে আল্লাহ্র নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব। তাঁর দেয়া বিধান হবে মানুষের সমগ্র জীবনের জন্য—আত্মিক, আধ্যাত্মিক

ও বৈষয়িক, বস্তুগত জীবনের জন্য অভিন্ন বিধান। তা ব্যক্তির ওপর পরিবারের ওপর, সমাজের ওপর, রাষ্ট্রের ওপর, ধন-সম্পদের ওপর কার্যকর হবে একচ্ছত্রভাবে। সেখানে এই সংস্থাসমূহের পরস্পরে কোন বিরোধই থাকবে না।

বিশ্বনবীর উপস্থাপিত জীবন-বিধান ইসলামে সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে স্বীকৃত রাষ্ট্রশক্তি। কুরআন মজীদে এই রাষ্ট্রশক্তিকে বলা হয়েছে 'আল-হাদীদ'—লৌহ বা ইস্পাত, যা অমোঘ ও জবরদস্ত শক্তির ধারক। রাষ্ট্রও তা-ই। এই জবরদস্ত শক্তির ধারক রাষ্ট্রের ওপর সার্বভৌমত্ব হবে একমাত্র আল্লাহ্‌র। মানুষ তার সমগ্র জীবন মৌলিকভাবে মেনে চলতে বাধ্য সেই এক আল্লাহ্‌কে। তাই তাঁর দেয়া আইনের অনুসারী হতে হবে রাষ্ট্রকে, রাষ্ট্রের সরকারটি শাখা-প্রশাখাকে। মানুষ সেখানে মৌলিকভাবে কোন আইন রচনা করবে না; আল্লাহ্‌র দেয়া আইনই হবে মৌলিক আইন, আইনের প্রধান উৎস। প্রশাসন চলবে সেই আইন অনুযায়ী। বিচার বিভাগ সেই আইনের ভিত্তিতেই বিচারকার্য সম্পন্ন করবে।

দুনিয়ার ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। মানুষ যে কর্মশক্তি ও মেধাশক্তির বলে সে ধন-সম্পদ উপার্জন করে, সে কর্মশক্তি ও মেধাশক্তিও একমাত্র আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। তাই মানুষের উপার্জিত ধন-সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্। মানুষ তার আমানতদার মাত্র। আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান অনুযায়ী মানুষ উপার্জন করবে—ব্যয় ও সঞ্চয়ও করবে তাঁরই বিধান অনুযায়ী।

বিশ্বনবী ইসলামের যে অর্থ ব্যবস্থা উপস্থাপন করেছেন, তাতে ধন-সম্পদের আসল মালিক যেহেতু আল্লাহ্, তাই তাতে সব মানুষের সমান অধিকার স্বীকৃত। এই ধারণার ভিত্তিতে যে পূর্ণাঙ্গ অর্থ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তাতে কোন মানুষই তার জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ধন-সম্পদ থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে না। তাই ইসলামের ভিত্তিতে যে রাষ্ট্র-সরকার গঠিত হবে, তার সর্বপ্রথম দায়িত্ব হচ্ছে প্রত্যেকটি নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধান; খাওয়া, পরা, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা থেকে কোন একটি মানুষও বঞ্চিত হবে না—এই নিরাপত্তা দান।

ধন-সম্পদের আমানতদারী যেহেতু মানুষের উপার্জন সাপেক্ষ আর মানুষের কর্মশক্তিতে রয়েছে কম-বেশীর পার্থক্য, তাই কেউ যেমন বেশী উপার্জন করতে পারে, যা তার মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত; কেউ কম উপার্জন করতে পারে, যা তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য অপর্যাপ্ত। তাই ইসলামের বিধান হচ্ছে, বেশী ধনের আমানতদাররা কম পরিমাণ উপার্জনকারীদের অভাব পূরণ করে দেবে, অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করে দেবে। সমাজে এমন লোক থাকাও খুবই স্বাভাবিক, যারা কিছুই উপার্জন করতে পারে না। তাদের প্রয়োজনও অপূরিত থাকতে পারে না কোনক্রমেই। সেজন্য বেশী পরিমাণ ধন-সম্পদের আমানতদারদের ওপর যাকাত ও ফসলের ওশর দেয়া ফরয

করা হয়েছে। এই যাকাত ও ওশর দিয়ে প্রধানত উপার্জনহীন লোকদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। আর তার পরে কম পরিমাণ উপার্জনকারীদের ঘাটতিটা পূরণ করে দিতে হবে। সর্বোপরি মানুষের নাগরিক স্বাধীনতা, বাক-সমালোচনার অধিকার ও সভা-সম্মেলনের স্বাধীনতা কখনই হরণ করা যেতে পারে না। এই অধিকার সেই আল্লাহ্‌রই দেয়া যিনি আসমান-জমিনের সব কিছুর একচ্ছত্র মালিক।

বিশ্বনবী উপস্থাপিত ইসলামের অর্থ ব্যবস্থাই দুনিয়ার একমাত্র ব্যবস্থা, যা নির্বিশেষে সমস্ত নাগরিকের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা দেয়, কার্যকর করে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দানের নীতি। দুনিয়ার অপর কোন অর্থ ব্যবস্থায়ই এই নীতি স্বীকৃত নয়। ফলে দুনিয়ার সেরা ধনী দেশেরও নাগরিকরা না খেয়ে থাকতে বাধ্য হয়। অন্য দিকে সমস্ত মানুষের স্বতন্ত্র আমানতদারীর অধিকার কেড়ে নিয়ে সবকিছুর মালিক-মুখ্তার বানানো হয়েছে যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে, সেখানেও মানুষ মৌলিক প্রয়োজন পূরণ থেকে বঞ্চিত থাকে। কঠিন শীতেও শীত নিবারণোপযোগী বস্ত্র, জুতা ও আশ্রয় থেকে বঞ্চিত থাকতে সে বাধ্য হচ্ছে। আর মানবীয় স্বাধীনতা—কথা বলার, সমালোচনা করার, সভা-সম্মেলন আহ্বানের কোন অধিকার থাকার তো প্রশ্নই উঠে না।

এ আলোচনায় অত্যন্ত সংক্ষেপে মানব রচিত প্রধান বিধান দুটির মৌলিক বিশ্লেষণের প্রতিকূলে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স) উপস্থাপিত ইসলামী বিধান সংক্ষিপ্তভাবে পেশ করেছি। এ দুয়ের মধ্যকার পার্থক্য অত্যন্ত প্রকট। এক্ষণে যারা নিতান্ত পশুর ন্যায় জীবন যাপনে ইচ্ছুক, তারা গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী বা সমাজতান্ত্রিক সমূহবাদী ব্যবস্থার যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারে। আর যারা ইহকালের মানবীয় মহান মর্যাদা সহ স্বাধীন-মুক্ত জীবন যাপন করে ইহ ও পরকালে কল্যাণময় জীবন লাভে আগ্রহী, তারা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স) উপস্থাপিত ইসলামী আদর্শবাদী জীবন যাপনের পথ অবলম্বন করতে পারে।

অবলম্বনের এই স্বাধীনতাও ইসলামের স্বীকৃত, যদিও দুটির পরিণতি অভিন্ন নয়। انَّا هَدَيْنَٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا (সূরা আদ-দাহর) 'আমরা মানুষকে পথ দেখিয়েছি হয়—সে আল্লাহ্‌র শোকরকারী হিসেবে জীবন যাপন করবে, না হয় আল্লাহ্-অস্বীকৃতির পথ অবলম্বন করবে। অতএব, এর যেটা ইচ্ছা মানুষ গ্রহণ করতে পারে।

রাসূলে করীম (স)-এর সামাজিক বিপ্লবের স্বরূপ

রাসূলে করীম (স) কে?

আমরা সকলেই জানি যে, রাসূলে করীম (স) বলে আমরা ইঙ্গিত করি হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি। তিনি ছিলেন আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর মাধ্যমেই নবুয়্যাতের ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে গেছে চিরদিনের তরে; বন্ধ হয়ে গেছে রিসালাতের সিলসিলার সব দুয়ার। অতপর আর কোন নবীর আগমন হবে না—আসবেন না আর কোন রাসূল।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ায় মানুষের বসবাস শুরু হওয়ার সেই প্রথম মুহূর্ত থেকে মানুষের জন্য জীবন-বিধান নাযিল করার মাধ্যম হিসেবে যে নবী-রাসূলগণকে পাঠানো শুরু করেছিলেন, তার সর্বশেষ ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁর মাধ্যমে নাযিল করা জীবন বিধান আল-কুরআনুল করীমই হচ্ছে আল্লাহ্র সর্বশেষ কিতাব। অন্য কথায়, জীবন-বিধান হিসেবে যে নিয়ামত আল্লাহ্ নাযিল করেছিলেন, তা এই কুরআন নাযিল হওয়ার মাধ্যমে সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। কিয়ামত পর্যন্তকার সকল কালের, সকল মানুষের জন্য যে জীবন-বিধানের প্রয়োজন, তা এই আল-কুরআনুল করীমেই বিধৃত। এর মাধ্যমেই মানুষের সব প্রয়োজন পূর্ণ হবে, পাওয়া যাবে সকল মানুষের সর্ব প্রকারের সমস্যাবলীর যথার্থ সমাধান। অতপর এমন কোন সমস্যারই সৃষ্টি হবে না, যার নির্ভুল সমাধান এই কুরআনুল করীমে পাওয়া যাবে না। তাই আল্লাহ্র নিকট থেকে নতুন করে কোন কিতাব নাযিল হওয়ার আর কোন প্রয়োজনই অবশিষ্ট থাকল না। থাকল না নতুন কোন নবী বা রাসূল আগমনের প্রয়োজনীয়তা।[১]

---

১. আল্লাহ্র আয়াত ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

আজকের দিন তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণ করে দিলাম, সম্পূর্ণ করলাম তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত এবং তোমাদের দ্বীন (জীবন-বিধান) হিসেবে আমি ইসলামকেই মনোনীত করলাম।

(মায়েদা ঃ ৩)

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ –

বরং তিনি আল্লাহ্র রাসূল ও নবীগণের সর্বশেষ। (সূরা আহযাব ঃ ৪০)

সামাজিক বিপ্লব বলতে কি বোঝায়?

প্রবন্ধের শিরোনামেই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, রাসূলে করীম (স) একটি সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু সামজিক বিপ্লব বলতে কি বোঝায়?

সকলেই জানেন, বিপ্লব অর্থ আমূল পরিবর্তন; যে জিনিসটি যেভাবে যে অবস্থায় ছিল, সে জিনিসটিকে সে অবস্থায় না রেখে—সে অবস্থায় থাকতে না দিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ভাবে ও ভিন্নতর অবস্থায় গড়ে তোলা। আর 'সামাজিক বিপ্লব' বলতে বোঝায়, মানুষের সমাজবদ্ধতাকে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দেয়া। যে চিন্তা-বিশ্বাস ও আদর্শের ওপর একটি সমাজ চলে আসছে, তাকে সম্পূর্ণ পরিহার করে ভিন্নতর চিন্তা-বিশ্বাস ও আদর্শের ভিত্তিতে সমাজটিকে গড়ে তোলা। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যে উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে গঠিত ও পরিচালিত এবং যে সামষ্টিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ তাকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে গঠন ও পরিচালন এবং ভিন্নতর ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করা।

বস্তুত সমাজ বলতে মানুষের সামষ্টিক জীবন বোঝায়। মানুষের জন্য সমাজ ও সামষ্টিক জীবন অপরিহার্য। কেননা মানুষ পশু নয়, পশুর বংশধরও নয়; বন্য জীবন মানুষের প্রকৃতি পরিপন্থী। এইজন্য সমাজতত্ত্ববিদগণ মানুষকে সামাজিক জীব বলে অভিহিত করে আসছেন চিরকাল ধরেই।

মানব সমাজের গঠন প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির পর দ্বিতীয় পর্যায়ে একজন পুরুষ ও একজন নারীর সম্মিলিত দাম্পত্য জীবন যাপন শুরুর মাধ্যমে পরিবারের ভিত্তি রচিত হয় এবং তা পূর্ণত্ব লাভ করে সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, ভাইবোন ও নিকটাত্মীয়ের সমন্বয়ে। এই পরিবারসমূহের সুসংবদ্ধ সমন্বয়ে গঠিত হয় সমাজ। আর সমাজ পূর্ণতা লাভ করে তার অনিবার্য ও অপরিহার্য প্রতিষ্ঠানসমূহ—যথা রাষ্ট্র, প্রশাসন, বিচার, অর্থোৎপাদন ও বন্টন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাদির পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ সাধনের মাধ্যমে।

এ হচ্ছে একটি সমাজের পূর্ণাঙ্গ কাঠামো ও সম্পূর্ণ রূপ। সমাজের প্রতিটি পর্যায়ে একটি আদর্শের প্রতিষ্ঠা ও কার্যকরতা অপরিহার্য। কোন-না-কোন আদর্শের প্রতি বিশ্বাসী ও তার অবিচল অনুসারী হতে হয় সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে। সেই আদর্শই একজন পুরুষ ও একজন নারীকে সংযুক্ত করে দম্পতিরূপে। আর দাম্পত্য জীবনের ফলেই বৈধ সন্তান-সন্ততির অস্তিত্ব সম্ভব ও স্বীকৃত। সেখানেই পুরুষ হয় সন্তানের পিতা, নারী হয় সেই পুরুষের স্ত্রী এবং সন্তানদের জননী। সেখানেই হয় ভাই ও বোন, দাদা ও চাচা। এই সবের সমন্বয়ে গঠিত পরিবারের লোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে ব্যক্তি পর্যায়ে গৃহীত সেই আদর্শ। সেই আদর্শই পরিবারে পিতার মর্যাদা ও অধিকার নির্ধারণ করে, স্ত্রীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। স্বামীর যেমন অধিকার ও মর্যাদা থাকে স্ত্রীর ওপর, তেমনি স্ত্রীরও মর্যাদা ও অধিকার স্থিরীকৃত হয় স্বামীর ওপর। পিতা হিসেবে সন্তানের ওপর মর্যাদা ও অধিকার নির্ধারিত হওয়ার সাথে

সাথে সন্তানের স্থান, মর্যাদা ও অধিকার নির্ধারিত হয় পিতা ও মাতার ওপর। অধিকারের সাথে সাথে দায়িত্ব ও কর্তব্যও নির্ধারিত হয় সর্ব পর্যায়ে ও পারস্পরিকভাবে। এই মর্যাদা, অধিকার ও কর্তব্য-দায়িত্ব নির্ধারিত হওয়া এবং যথাযথভাবে অনুসৃত ও পালিত হওয়া একটি নির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট এবং সকলের নিকট মৌলিকভাবে গৃহীত পূর্ণাঙ্গ আদর্শের ভিত্তিতেই সম্ভব। অন্য কথায়, একটি আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে উঠা পরিবারসমূহের সমন্বয়েই গঠিত হয় একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজ। এই পূর্ণাঙ্গতা সে লাভ করে তার জন্য অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান (Institution)-সমূহের মাধ্যমে। অর্থাৎ সমাজকে সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করা এবং ক্রমশ বিকাশের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য একান্তই অপরিহার্য হচ্ছে রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক সরকার (State and Government)। এই রাষ্ট্রকেই সমাজের লোকদের জীবন-মান-সম্মান-সম্ভ্রম ও ধন-মালের নিশ্চয়তা বিধান করতে হয়। পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদের সুষ্ঠু মীমাংসা ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানের জন্য প্রশাসনিক প্রভাবমুক্ত একটি নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা গঠন করতে হয়। জনগণের বৈষয়িক জীবনের সুষ্ঠুতার জন্য এমন একটি অর্থ ব্যবস্থা চালু করতে হয়, যদ্দ্বারা প্রতিটি নাগরিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভ করবে এবং জীবিকা উপার্জনের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাতে পারবে সকল প্রবঞ্চনা ও শোষণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে। সমাজের লোকদের প্রতিভা স্ফূরণ ও বিকাশ সাধনের জন্য—ভদ্র, শিষ্ট, মানবিক জীবন যাপনের যোগ্য বানানোর জন্য এবং ভবিষ্যত বংশধরদের উন্নতমানে গড়ে তোলার জন্য একটি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ও চালু রাখতে হয়। এ সবই একটি সমাজের পূর্ণত্বের জন্য অপরিহার্য শাখা-প্রশাখা। কিন্তু এর কোন একটি প্রতিষ্ঠান স্বতন্ত্রভাবে এবং সার্বিকভাবে গড়ে উঠতে ও চলতে পারে না একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শকে পুরাপুরিভাবে স্বীকার ও প্রতিষ্ঠিত না করে। একটি একক আদর্শই ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে ও পরিবারে, পরিবারে-পরিবারে ও সমাজে, সমাজে-সমাজে ও রাষ্ট্রে, রাষ্ট্রে ও প্রশাসনে, প্রশাসনে ও বিচার ব্যবস্থায়, সমাজ-রাষ্ট্র ও অর্থনীতিতে, সমাজ-রাষ্ট্র-অর্থনীতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতির মধ্যে একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও নিখুঁত সম্পর্ক স্থাপন ও সমন্বয় সাধন করতে পারে। এই আদর্শই হয় নিম্নপর্যায় থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায় ও তার সমস্ত শাখা-প্রশাখার আসল নিয়ামক বা নিয়ন্ত্রক।

এ দৃষ্টিতে সামাজিক বিপ্লব হচ্ছে সমাজের উক্ত সকল দিকে ও বিভাগে আমূল আদর্শিক পরিবর্তন সাধন। যে আদর্শ, রীতি-নীতি, দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবধারা নিয়ে একটি সমাজ চলতে থাকে, সমাজটিকে সেই দৃষ্টিভঙ্গি ভাবধারা ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত করে—সরিয়ে এনে সম্পূর্ণ ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গি ভাবধারা ও আদর্শের ওপর নতুনভাবে গড়ে তোলাই হয় সমাজ বিপ্লবের কাজ।

সমাজ জীবনে আদর্শের প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্দিষ্ট ও সর্বজনগৃহীত একটি আদর্শ ছাড়া সমাজ সম্পর্কে কোন ধারণা (Conception)-ই গ্রহণ করা যেতে পারে না। সেরূপ একটি আদর্শ ব্যতিরেকে কোন সমাজ গড়ে উঠতে ও চলতে পারে—তা

কল্পনাও করা যায় না। সমাজ তো হাওয়ার উপর দাঁড়াতে পারে না। কোন জমিনে বিপুল সংখ্যক পুরুষ-নারী, শিশু-যুবা-বৃদ্ধ বাস করলেই সে জমিনটাকে সমাজ বলা হয় না—বলা যায় না। সমাজ বলা যায় না এই বিচিত্র লোকদের ভিড় বা সমাবেশকে। সমাজ বললেই ব্যক্তি ও সমষ্টিগত মানুষের একটি সুসংবদ্ধতা—একটি সুসংবদ্ধ দল বোঝায়। কোন আদর্শ ছাড়া বিভিন্ন পর্যায়ের লোকদের মধ্যে সুসংবদ্ধতা আসতেই পারে না। সেজন্য একটি আদর্শ অপরিহার্য। অবশ্য সে আদর্শ ভালো কি মন্দ সে প্রশ্ন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তা যেমন ভালো হতে পারে, তেমনি মন্দ বা ভুল আদর্শও হতে পারে। আদর্শ ভালো হলে ভালো ও সুস্থ সমাজ গড়ে উঠবে, আদর্শ ভুল ও মন্দ হলে মন্দ সমাজ—বিভ্রান্ত, অসুস্থ সমাজ গড়ে উঠবে, এ তো অতি স্বাভাবিক ব্যাপার।

একটু আগে একক আদর্শের কথা বলেছি। বস্তুত সর্বাঙ্গীন সমাজ কাঠামোর যে চিত্র ইতিপূর্বে তুলে ধরেছি, তা একটি মাত্র আদর্শের ওপরই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সমাজের বিভিন্ন দিক, বিভাগ ও শাখা-প্রশাখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বিত ও অনুসৃত হলে সামাজিক সুসংবদ্ধতা অকল্পনীয়। শুধু তাই নয়, সমাজের বিভিন্ন অংশ ও শাখা-প্রশাখার মধ্যে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব এবং পরিণামে পারস্পরিক সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে বিভিন্ন আদর্শ কিংবা আদর্শিক ও দৃষ্টিভঙ্গিগত বিভিন্নতার কারণে।

তাই একটি নির্দিষ্ট আদর্শকে ভিত্তি করে ব্যক্তি, পরিবার , সমাজ, সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যথা রাষ্ট্র, সরকার, প্রশাসন, বিচার, অর্থ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি গড়ে তোলাই সমাজ গঠনের বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া। এর ব্যতিক্রম হলে সমাজ সুষ্ঠুরূপে গড়ে উঠতে পারে না, গড়ে উঠলেও স্থির ও স্থায়ী হয়ে থাকতে পারে না, একথা অনস্বীকার্য।[১]

আদর্শভিত্তিক সমাজ গঠনের এই দার্শনিক আলোচনা পর্যায়ে আমাদেরকে দুটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। প্রথম ঃ সমাজকে তার পুরাতন আদর্শ, রীতিনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরিয়ে এনে সম্পূর্ণ নতুন একটি আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে তোলা চাট্টিখানি কথা নয়। মুখে প্রচলিত আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির দোষ-ত্রুটি ও ভুল-ভ্রান্তি চিহ্নিত করে নতুন বা ভিন্নতর একটি আদর্শ, তার বৈশিষ্ট্য ও কল্যাণকর অবদানের কথা বলে দিলেই সমাজের লোকেরা আবহমানকাল থেকে গৃহীত, অনুসৃত ও অভ্যস্ত আদর্শ পরিত্যাগ করে নতুন আদর্শ ঝড়ের বেগে গ্রহণ করে তার অনুসরণ করতে শুরু করে দেবে—তা কল্পনা করা যায় না। বাস্তবে তা সম্ভবও হতে পারে না। সেজন্য আদর্শভিত্তিক বিপ্লব সৃষ্টির উদ্যোগীকে আদর্শিক বিশ্বাসের দৃঢ়তা, কর্ম প্রেরণার অবিচলতা ও প্রতিকূল অবস্থার মুকাবিলায় অনমনীয়তা এবং সর্ব প্রকারের ত্যাগ-তিতিক্ষার ধারক হতে হবে। ঘাত-প্রতিঘাত, নির্যাতন-নিষ্পেষণ, বিরুদ্ধতা ও

---

১. وتستنتج من هذا النظام الاجتماعي ....بناء المجتمع الاسلام

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, সমাজ সংস্থা, রীতিনীতি ও সম্পর্কের সমষ্টি, যে বিষয়ে সমাজের সব লোক একমত।

শত্রুতা নীরবে সহ্য করতে প্রস্তুত থাকতে হবে, যাকে ইংরেজীতে বলা হয় Devotion—অন্যথায় তার ব্যর্থতা অনিবার্য।[১]

দ্বিতীয় ঃ ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের ক্ষেত্রে একটি ভিন্নতর বা নতুন আদর্শের প্রতিষ্ঠা নেহাত গায়ের জোরে বা শক্তি প্রয়োগের দ্বারা সম্ভব হতে পারে না। সেজন্য যে কাজটি করতে হয়, তাকে ইংরেজীতে বলা হয় Motivation। অন্য কথায়, সমাজে আদর্শিক বিপ্লব সৃষ্টির জন্য গোটা সমাজকে—ব্যক্তি, পরিবার, রাষ্ট্র, সরকার, বিচার বিভাগ, অর্থ বিভাগ ও শিক্ষা বিভাগকে সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে, যা নিতান্ত জোর-জবরদস্তি, ভয়-ভীতি, চাপ সৃষ্টি ও প্রলোভন দ্বারা কখনই সম্ভবপর হতে পারে না। সেজন্য এক দিকে বিদ্যমান সামাজিক অবস্থার অবক্ষয়, হীনতা, কদর্যতা, বীভৎসতা স্পষ্ট করে সমাজের লোকদেরকে ভাবিত ও চিন্তান্বিত করে তুলতে হবে, সেই সাথে অপরদিকে নতুন আদর্শের বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য, অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য-মহিমা-মাহাত্ম্য ও কল্যাণকর অবদানের কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠভাবে পেশ করে তা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের নির্বিশেষ ও উদার-উন্মুক্ত আহবান জানাতে হবে। এভাবে আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার একটি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব-ভিত্তিক আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে; অবিশ্রান্ত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে চালাতে থাকতে হবে এক সাথে দ্বিমুখী কর্মধারা। একটি হচ্ছে বিস্তার ও সম্প্রসারণ (Expansion) আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে সুদৃঢ় ও সুসংবদ্ধকরণ (Consolidation)। এটা আদর্শ প্রতিষ্ঠার বা আদর্শভিত্তিক সমাজ গঠনের বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স) যে প্রক্রিয়ায় সামাজিক বিপ্লব সৃষ্টির কাজ করেছেন, তাতে আমরা এই বৈজ্ঞানিকতা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও প্রকট রূপে দেখতে পাই। তাই বলতে পারি যে, রাসূলে করীম (স)-এর সামাজিক বিপ্লব প্রক্রিয়ার এই-ই হচ্ছে স্বরূপ।

রাসূলে করীম (স)-এর সময়ে সমাজ

আমরা সকলেই জানি যে, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স) লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডের প্রসিদ্ধ নগর মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেখানেই তিনি লালিত-পালিত ও বর্ধিত হয়েছিলেন। এই নগরের অধিবাসীরা একটি প্রাচীনতম সমাজের উত্তরাধিকারী। ঐতিহাসিকভাবে এই নগরের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল চার হাজার বছর পূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরদের দ্বারা, যদিও প্রায় সেই একই সময়ে আরও কোন কোন বংশের লোকেরা এখানে বসতি স্থাপন করেছিল।

নবী করীম (স)-এর জন্মের সময়কালীন আরব উপদ্বীপের একটা মোটামুটি চিত্র তুলে ধরার জন্য বলতে হচ্ছে—এই সময়ের আরবরা নৈতিক চরিত্রের দিকে দিয়ে

---

১. وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ - اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ

সব মানুষ সুস্পষ্ট ধ্বংসের মধ্যে বিরাজমান। রক্ষা পাবে শুধু তারা, যারা ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে, পরস্পর সত্যের ও ধৈর্য ধারণের উপদেশ ও পরামর্শ দিয়েছে।

অধঃপতনের চরম সীমায় পৌছে গিয়েছিল। ব্যভিচার, মদ্যপান ও জুয়াখেলা ছিল তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম। নির্মমতা ও স্ব-কল্পিত আত্মম্ভরিতা তাদেরকে সন্তান হত্যার বীভৎসতা পর্যন্ত পৌছে দিয়েছিল। ছিনতাই, অপহরণ ও কাফেলার ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে হত্যাযজ্ঞ সৃষ্টি ও ধন-সম্পদ লুটে-পুটে নেয়াই ছিল তাদের অর্থনৈতিক তৎপরতা। নারী সমাজ ছিল সম্পূর্ণ অবহেলিত ও মানবিক অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। তারা পশুকুল ও বস্তুসম্পদের ন্যায় উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তরিত হত। বহু প্রকারের খাদ্য কেবল পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, যা নারীদের খাওয়ার অধিকার ছিল না। পুরুষরা অসংখ্য নারীকে ভোগ করার স্বাধীনতা ভোগ করত। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও নাচ-গান-স্ফূর্তিতে তারা মশগুল হয়ে থাকত। দারিদ্র ও খাদ্যাভাবের চিন্তায় তারা সন্তান হত্যা করত; জীবন্ত সন্তানকে সূতিকাগারে গলা টিপে বা অন্যভাবে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হত। আর যে সন্তানকে সূতিকাগারে হত্যা করা কোন কারণে সম্ভব হত না, পরবর্তীকালে তাকে জীবন্ত কবর দেয়া হত। কুরআন, হাদীস এবং ইতিহাসে এর সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।[১]

> সে সমাজে জনগণের জীবন ছিল গোত্রভুক্ত। আর গোত্রীয় হিংসা-বিদ্বেষ রক্তক্ষয়ী অবস্থার সৃষ্টি করত। গোত্রসমূহের মাঝে একবার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হলে তা বংশানুক্রমিকভাবে ও শত শত বছর ধরে চলত আর তাতে হাজার হাজার মানুষের জীবন নিঃশেষ হয়ে যেত।

তখনকার আরব দেশে আধুনিক ধরনের কোন রাষ্ট্র বা সরকার ব্যবস্থা ছিল না। পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসা বা মজলুমের ফরিয়াদ শোনার জন্য কোন বিচার ব্যবস্থা ছিল না। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ বা বৈদেশিক আগ্রাসন প্রতিরোধের জন্য কোন সুসংগঠিত সেনাবাহিনী ছিল না। প্রশাসনিক কোন কর্তৃপক্ষ ছিল না 'কর' ধার্য ও আদায় করার জন্য। অপরাধীর বিচার ও শাস্তি দানেরও কোন ব্যবস্থা ছিল না। কোন ব্যক্তির কোন অধিকার বা মর্যাদা সুরক্ষিত ছিল না; কেউ অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে তা ফিরিয়ে দেয়ারও কেউ ছিল না। এক এক গোত্রের অন্তর্ভুক্ত লোকদের কোন সম্পর্ক বা যোগাযোগ ছিলনা অপরাপর গোত্রের লোকদের সঙ্গে। মানুষ ছিল মরুভূমির উন্মুক্ত প্রান্তরের পশুকুলের মত লাগামহীন। গোত্রের সর্বাধিক প্রবীন ব্যক্তি (যে অধিক ধন-সম্পদের মালিক ও সমধিক প্রভাবশালী)-কে গোত্রের সরদার বানানো হত। কোন গোত্রের লোকসংখ্যা বেশী হয়ে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে গেলে এক-একটি শাখা-গোত্র স্বাধীন ও স্বতন্ত্র গোত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করত। এভাবে গোত্র ব্যবস্থা সমগ্র আরবে বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত হয়ে পড়েছিল। গোত্র ব্যবস্থায় কোন গোত্রের একজন লোক যদি অন্যায় করত অন্য গোত্রের কোন ব্যক্তির সাথে, তাহলে তার

---

১. تاريخ الاسلام- السياسى ولدين - السيرة النبوية لابى الحسن علي والثقاف والاجتماعي - الندوا٦٨١ للدكتور حسن ابراهيم حسن ج ا -

গোত্রের সব লোক তাকে পূর্ণ সমর্থন দিত। প্রয়োজন হলে তার জন্য যুদ্ধও শুরু করে দিত।[১]

তখন মক্কা তথা গোটা আরবে প্রচলিত ছিল মূর্তিপূজার ধর্ম (দ্বীন)। আমর ইবনে লুহাই নামের খুজায়ী বংশের এক ব্যক্তি সিরিয়া থেকে এই মূর্তিপূজার পদ্ধতি কা'বায় এনে স্থাপন করেছিল। ভাগ্য গণনার জন্য বা কাজের ভালো-মন্দ ফল জানবার জন্য তারা তীর ব্যবহার করত এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। লাত, মানাত, হুবল, ওজ্জা প্রভৃতি ছিল কুরাইশ বংশের লোকদের সেরা মূর্তি। তারা এসব মূর্তির সন্তুষ্টির জন্য সেগুলোর সামনে পশু বলি দিত। লেখাপড়া ও জ্ঞান চর্চার কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা ছিল না। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু লোক নিজস্ব চেষ্টা ও উদ্যোগে কিছু পরিমাণে লেখাপড়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বলা যায়, মক্কা ছিল একটি নগর এবং সেখানকার জীবন ধারা, বিবেক-বুদ্ধি, সামাজিকতা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির দিক দিয়ে ছিল সম্পূর্ণ বাল্যাবস্থায়। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের মক্কা যাযাবরত্ব (Nomadism) থেকে সভ্যতার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেছিল বলা যায়। তবে সে সভ্যতা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ অর্থে।[২]

সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায়—তদানীন্তন সমগ্র দুনিয়া, বিশেষ করে গোটা আরব উপদ্বীপ ছিল প্রগাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত। আর মক্কা নগরের অবস্থান ছিল সূচিভেদ্য অন্ধকারের নিম্নদেশে। অথচ এ নগরেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বশেষ নবী ও রাসূল (স)-কে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কেন?

আরব উপদ্বীপ ও মক্কা নগরে শেষ নবীর জন্ম হল কেন?

শির্ক, পৌত্তলিকতা, যাযাবরত্ব ও নৈতিক অতঃপতনের দিক থেকে তুলনামূলকভাবে সব চাইতে বেশী অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল তদানীন্তন আরব উপদ্বীপ এবং বিশেষভাবে মক্কা নগরী। আল্লাহ তা'আলা এ নগরেই 'তওহীদী নূর'-এর আবির্ভাবের ব্যবস্থা করেছিলেন। কেননা এই মক্কা নগরই ছিল সেই নূরের মুখাপেক্ষী সবচাইতে বেশী। আর আরবদের কতকগুলো মৌলিক মানবীয় গুণ এমন ছিল, যার দরুণ আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা তওহীদী আদর্শ ধারণ ও সমগ্র আরবে তার বিস্তার সাধনের মাধ্যম হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়েছিল। তাদের হৃদয়-পাত্র ছিল স্বচ্ছ ও শূন্য; তখন পর্যন্ত তাতে কিছুই লিখিত হয়নি। তাই তাতে কিছু মুদ্রিত করা হলে তা সহজে মুছে যাবে না বলে আশা করা গিয়েছিল। আরবরা ছাড়া তখনকার দুনিয়ার অপরাপর জাতি ও জনগোষ্ঠী নিজস্ব চিন্তা-বিশ্বাস-দর্শন সম্পদে ছিল সমৃদ্ধ। আরবদের যে মূর্খতা ছিল, তা মুছে ফেলা ছিল সহজ এবং সেখানে নতুন আকীদা ও বিশ্বাসের বীজ বপন করা হলে তাদের মেধা তাকে উৎকর্ষিত ও বিকশিত করতে ছিল পারঙ্গম। তারা ছিল সরল-সোজা

---

১. تاريخ الاسلام السياسى والدين والثقاف والاجتماعى

২. السيرة النبوية لابى الحسن على ندوى ص-٦٩

কথার মানুষ; যা বলত. তা করতে ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এমনকি সেজন্য জীবন দিতে হলেও তাতে পিছপা হত না। আকাবা'র বায়'আত করতে এসে আওস ও খাজরাজ বংশের লোকেরা বলেছিল, আমরা আপনাকে মদীনায় নিয়ে যেতে চাই আমাদের ধন-সম্পদের বিপদ ও আমাদের সেরা লোকদের জীবন নাশের ঝুঁকি সহকারে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, তাঁরা তাদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণমাত্রায় পূরণ ও রক্ষা করেছে, তাতে একবিন্দুও ব্যতিক্রম দেখা যায়নি।[১]

রাসূলে করীম (স)-এর সামাজিক বিপ্লবের সূচনা-পর্ব

তখনকার দুনিয়া এবং বিশেষ করে আরব উপদ্বীপ ও মক্কার যে সাধারণ ও সর্বাত্মক বিপর্যস্ত অবস্থা ছিল, তাতে মানবতার জন্য আল্লাহ্র প্রেরিত একজন রাসূলের প্রয়োজন অত্যন্ত তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল। খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে নিছক কোন সমাজ সংস্কারক, শিক্ষা-গুরু, দার্শনিক—নিছক কোন ধর্ম প্রবর্তকের অথবা কোন স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রনেতার পক্ষে কিছুই করার ছিল না। শুধু আকীদা-বিশ্বাসের সংশোধন, কোন খারাপ অভ্যাসের পরিবর্তন সাধন বা সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন বা আরব উপদ্বীপ ও তার অরাজনৈতিক জীবনে রাষ্ট্র ও রাজনীতি প্রবর্তনও কোন কাজ ছিল না। বলতে গেলে, এ ধরনের লোকের তেমন কোন অভাবও ছিল না। কিন্তু তাদের কারোর পক্ষেই আরব দেশের তখনকার প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব ছিল না।[২]

এই সময় প্রয়োজন ছিল সর্বগ্রাসী জাহিলিয়াতের জগদ্দল পাথরের তলা থেকে বিশ্ব মানবতাকে উদ্ধার করার; প্রয়োজন ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক বিপ্লবের। হযরত মুহাম্মাদ (স) সেই পূর্ণাঙ্গ সামাজিক বিপ্লবের দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যেই প্রেরিত হয়েছিলেন এবং কার্যত তা পালন করে তাঁর উপর অর্পিত মিশন তিনি পুরামাত্রায় সফল করে গেছেন।[৩]

নবী করীম (স)-এর প্রতি হেরা গুহায় প্রথম ওহী নাযিল হলে এটা তো জানা এবং বোঝা গিয়েছিল যে, তিনি আল্লাহ্র মনোনীত নবী ও রাসূল। কিন্তু তাঁকে কি কাজ করতে হবে, তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য কি এবং তা কিভাবে পালন করতে হবে, এ বিষয়ে তখন কিছুই জানা যায়নি। প্রথম ওহীর পর কিছু দিন অতিবাহিত হয়ে যায়। তারপর সূরা আল-মুদ্দাস্সিরের প্রথম সাতটি আয়াত এক সঙ্গে নাযিল হয়।

---

১. السيرة النبوية لابى الحسن على ندوى ص – ٦٩

২. السيرة النبوية لابى الحسن على ندوى ص – ٦٩

৩. هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ

সেই মহান আল্লাহ্ই তাঁর রাসূলকে হেদায়েতের বিধান ও আল্লাহ্র আনুগত্য ব্যবস্থাসহ পাঠিয়েছেন, যেন তাকে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য সকল জীবন ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী করে তোলেন। (তওবা ঃ ৩৩, সাফ ঃ ৯, আল-ফাত্হ ঃ ২৮)

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ - قُمْ فَاَنْذِرْ - وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ - وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ -
وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ - وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ - وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ -

হে কম্বল-জড়ানো চিন্তাক্লিষ্ট ব্যক্তি! উঠ এবং (লোকদের) সতর্ক কর, তোমার রব্ব-এর বড়ত্ব প্রতিষ্ঠিত কর। তোমার নিজের ভূষণ পবিত্র কর। সর্বপ্রকারের ক্লেদ-কালিমা পরিহার কর। বেশী পাওয়ার আশায় অনুগ্রহ কর না এবং তোমার রব্ব-এর জন্য ধৈর্য অবলম্বন কর। (মুদ্দাসসির ঃ ১ হইতে ৭)

এ আয়াত কয়টির মাধ্যমেই প্রথমবারের মত তাঁকে নির্দেশ দেয়া হল ঃ আপনি উঠুন এবং বিশ্বমানব যে পন্থা ও পদ্ধতিতে জীবন যাপন করছে, তার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দিন—সজাগ সচেতন ও ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলুন। দুনিয়ায় মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বভৌমত্বের ডংকা বাজছে, মানুষ মানুষের গোলাম হয়ে আছে; আপনি উঠুন, আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের কথা ঘোষণা করুন এবং তা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করার কাজ শুরু করে দিন। এই কাজটি যথার্থ ও পূর্ণ যোগ্যতা সহকারে সমাধা করার জন্য প্রথমে আপনার নিজের জীবন সর্বতোভাবে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হতে হবে। আপনি সমস্ত বৈষয়িক স্বার্থ ও সুবিধার দিক হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে পরিপূর্ণ ঐকান্তিকতা, নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থপরতা সহকারে মানব সাধারণের সার্বিক সংশোধন ও উন্নয়নের কাজে মনোযোগী হোন। মানুষের কল্যাণে আপনি যা কিছু করবেন, তাদের নিকট থেকে তার বেশী পেতে চাইবেন না। নিঃসন্দেহে এ এক বিরাট কাজ। এ কর্তব্য পালনে সুকঠিন অসুবিধা, জটিলতা, সমস্যা, বিরুদ্ধতা ও শত্রুতার সম্মুখীন হওয়া অবধারিত। তাই এজন্য আপনাকে অশেষ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার গুণে গুণান্বিত হতে হবে। সে সব আপনাকে সহ্য করতে হবে আপনার রব্ব-এর জন্য। তাঁরই নির্দেশিত কাজ করতে আপনি ধৈর্য ধারণ করবেন তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে।

এ আয়াত কয়টি থেকে রাসূলে করীম (স)-এর সামাজিক বিপ্লবের যে স্বরূপ বোঝা যায়, তা হচ্ছে ঃ এটি হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নিজের পরিকল্পিত কোন কাজ নয়; বরং স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের নির্দেশিত। এ কাজের লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র মানব সমাজের ওপর একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং তার পূর্বে মানবীয় প্রাধান্য ও সার্বভৌমত্ব উৎখাত করা। এ কাজ দুনিয়ায় প্রচলিত তথাকথিত রাজনৈতিক তৎপরতা ও ক্ষমতা দখলের কোন প্রতিযোগিতা নয়। এটি হচ্ছে নিজেকে ও বিশ্বমানবকে সকল প্রকার শিরক-এর কলুষতা ও কদর্যতা থেকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে মহান আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ ও পরিপূর্ণ বান্দা বানানোর কাজ। আর সেজন্য নিছক ধর্ম প্রচারের পদ্ধতিতে কিংবা ক্ষমতা দখলের পদ্ধতিতে কাজ করলে লক্ষ্যে পৌছা সম্ভব হবে না; সেজন্য পরম ধৈর্য ও অনমনীয়—অন্য কথায় বিপ্লবাত্মক পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে। বলা বাহুল্য, এই হচ্ছে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার আল্লাহ্-নির্দেশিত পদ্ধতি।

অতপর রাসূলে করীম (স) প্রথমে নির্দেশ পান ঃ

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ - وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

এবং তোমার নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক কর এবং যারা ঈমান এনে তোমার অনুসরণ অবলম্বন করবে, তাদের কল্যাণে তোমার বাহু বিছিয়ে দাও।

(শু'আরা ঃ ২১৪ ও ২১৫)

এ নির্দেশ পেয়ে রাসূলে করীম (স) কুরাইশ বংশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে নিজের ঘরে আমন্ত্রিত করে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করেন। তখনও তাঁর দাওয়াত ছিল সম্পূর্ণ প্রাথমিক এবং অত্যন্ত গোপন পর্যায়ের। এই সূচনা পর্বে তাঁর দাওয়াতের সারনির্যাস ছিল এই মহাসত্য যে, এ বিশ্বলোকে আল্লাহ্ই হচ্ছেন একমাত্র ইলাহ্, তিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ্ নেই। মুহাম্মাদ (স) তাঁর নবী ও রাসূল। আর পরকাল অবশ্যই হবে; আল্লাহ্র সম্মুখে প্রতিটি মানুষকে ইহজীবনের যাবতীয় কাজের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে। সে অনুযায়ী তিনি শুভ পুরস্কার কিংবা কঠিন শাস্তির ফয়সালা করবেন, যা কার্যকর হওয়া থেকে কেউ-ই নিস্কৃতি পাবে না। সেই সাথে তিনি মূর্তিপূজা ও মানুষের দাসত্ব সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে এক আল্লাহ্র নিকট পূর্ণমাত্রায় আত্মসমর্পণের আহ্বান জানান।

এই প্রাথমিক ও গোপন পর্যায়ের দাওয়াত কবুল করে যাঁরা মুমিন সমাজে শামিল হন, তাঁদের মধ্যে মক্কার উচ্চ বংশীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন তদানীন্তন সমাজের দরিদ্রতম ও ক্রীতদাস পর্যায়ের লোক; যেমন পুরুষরা শামিল ছিলেন, তেমনি নারীরাও। তাঁদের মধ্যে পূর্ণবয়স্ক লোক যেমন ছিলেন তেমনি ছিল কম বয়স্ক বালকও। তাদের মধ্যে যেমন ছিলেন ব্যবসায়ী, তেমনি ছিলেন বড় বড় যোদ্ধা ও সামরিক নেতৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ; বিদেশীদের মধ্য থেকে ছিলেন সালমান ফারসী, সুহাইব রুমী ও বিলাল হাবশী প্রমুখ।

এদের মধ্যে আরকাম ইবনে আবুল আরকাম নামক ব্যক্তিও ছিলেন এবং 'সাফা' পবর্তের ওপরে অবস্থিত তাঁর ঘরটি ছিল রাসূলে করীম (স)-এর ইসলামী দাওয়াতের গোপন কেন্দ্র। এই কেন্দ্রভিত্তিক দাওয়াতী কর্মকাণ্ডের ফলে আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ তওহীদী দ্বীন কবুল করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এটা ছিল ব্যক্তিগতভাবে তওহীদী দাওয়াতের পর্যায়। কেননা এ সময় পর্যন্ত নবী করীম (স) ব্যক্তিগতভাবে এক-একজনকে এই দাওয়াত দিতেন এবং লোকেরা ব্যক্তিগতভাবেই তা গ্রহণ করতেন। এরপরই শুরু হয় প্রকাশ্য ও সামষ্টিক পর্যায়ের দাওয়াতী কার্যক্রম।[১]

---

১. تاريخ الاسلام السياسى والدنى والثقافى والاجتماعى

প্রকাশ্য দাওয়াতের সূচনা

অতপর তাঁর প্রতি দ্বিতীয় নির্দেশ নাযিল হল ঃ

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ - اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ - الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ - فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ -

অতএব হে নবী! তোমাকে যে কাজের আদেশ করা হয়েছে, তা তুমি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও প্রকাশ্যভাবে লোকদের মধ্যে প্রচার করে দাও। যারা এখনও শির্কী আকীদায় নিমগ্ন রয়েছে বা থাকবার সিদ্ধান্ত করে আছে, তাদের পরোয়া কর না। তারা তোমার এই বিপ্লবী কর্মতৎপরতার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে; আমরাই তাদের মুকাবিলা করার জন্য যথেষ্ট। ওরাই তো আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য ইলাহ্ যোগ করে নিয়েছে। তাদের এ অবস্থার মারাত্মক পরিণতি তারা শীগ্‌গীরই জানতে পারবে। (হিজর ঃ ৯৪ হইতে ৯৬)

এই নির্দেশ পেয়েই নবী করীম (স) মক্কার লোকদের সম্মুখে তাঁর শির্ক পরিহার ও তওহীদী আকীদা গ্রহণের দাওয়াত প্রকাশ্যভাবে পেশ করার উদ্দেশ্যে সাফা পর্বতের শীর্ষে দাঁড়িয়ে মক্কাবাসীকে সমবেত হওয়ার জন্য আহ্‌বান জানালেন। লোকেরা দ্রুত ঘর থেকে বাইরে এসে ওপরের দিকে তাকিয়ে মুহাম্মাদ (স)-কে দেখতে পেয়ে এ আহবানের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারল। মুহাম্মাদ (স)-এর জিজ্ঞাসার জবাবে তারা একবাক্যে বলল ঃ 'আমরা এ পর্যন্ত তোমাকে সত্যবাদী পেয়েছি, তুমি মিথ্যা বল না, কাউকে ধোঁকা দাও না।' মুহাম্মাদ (স) পর্বতের শিখরে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি পর্বতের উভয় দিকই সমানভাবে দেখছিলেন। ভেতরে জনবসতির দিক এবং বাইরের উন্মুক্ত দিক একই সাথে তাঁর গোচরীভূত ছিল। কিন্তু পর্বতের পাদদেশের সমবেত জনতা কিছুটা ভেতরের দিকে থাকায় বাইরের দিক ছিল তাদের চোখের আড়ালে। তারা মাত্র একটি দিকই দেখতে পাচ্ছিল। মূলত জ্ঞান ও অবহিতির দিক দিয়ে জনসাধারণ ও তাঁর মধ্যে এটাই ছিল পার্থক্যের মৌল বিন্দু। সাধারণ মানুষ শুধু ইহকাল ও ইহজীবন—বস্তুগত দিকটিই দেখতে পায়, তাদের নিজস্ব জ্ঞান শুধু এই বস্তুজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু নবী করীম (স) ইহকাল—ইহজীবন তথা বস্তুজগত সম্পর্কিত জ্ঞান ও অবহিতির সঙ্গে সঙ্গে পরকালীন জীবন তথা আত্মিক ও আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানেরও অধিকারী ছিলেন।[১] তিনি নিজের সত্যতা ও সত্যবাদিতার সাধারণ স্বীকৃতি আদায় করে বললেন ঃ

قُلْ اِنَّمَا اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ج اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ

---

১. السيرة النبوية لابى الحسن على ندوى

تَتَفَكَّرُوْا مَابِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ط اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ - قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ط اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ج وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ -

আমি তোমাদেরকে শুধু একটি কথার নসীহত করছি। তোমরা আল্লাহ্র জন্য দাঁড়িয়ে যাও দুজন দুজন এবং একজন একজন করে। পরে তোমরা গভীরভাবে চিন্তা ও বিবেচনা করে দেখ আমার এই আহ্বানের গভীর ও সূক্ষ্ম তাৎপর্য ও অন্তর্নিহিত পরম সত্য। তোমাদের এই সঙ্গী তো পাগল বা জ্বিন প্রভাবিত নয়। সে তো কঠিন আযাব আসার প্রাক্কালে তোমাদের জন্য সতর্ককারী মাত্র। বল, আমি তো তোমাদের নিকট কোন মজুরী বা পারিশ্রমিক চাইনি। এই যা কিছু করছি, তা কেবলমাত্র তোমাদের কল্যাণের জন্যই। আমার যা কিছু প্রাপ্য, তা তো আল্লাহ্র নিকট (তোমাদের নিকট নয়)। আর আল্লাহ্ তো সব কিছু দেখছেন প্রত্যক্ষভাবে। বল, আমার রব্ব আমার প্রতি প্রকৃত সত্য ওহীই পাঠিয়েছেন। তিনি সকল গোপন অজানা সত্য ও তত্ত্ব খুবই পূর্ণত্ব সহকারে জানেন। (সাবা ঃ ৪৬ ও ৪৭)

এই প্রকাশ্য দাওয়াত শুরু হওয়ার পর প্রথমে ঠাট্টা-বিদ্রূপ-উপহাস এবং পরে মারাত্মক শত্রুতা শুরু হয়ে যায়। এই সময় খোদ রাসূলে করীম (স)-এর প্রতি এবং তাঁর এই বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত দুর্বল স্তরের মুমিনগণের ওপর জুলুম, নির্যাতন ও নিপীড়নের পাহাড় ভেঙে পড়ে। তিনি আল্লাহ্র নির্দেশ এবং তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সবকিছুই নীরবে সহ্য করছিলেন। দুর্বল স্তরের মুমিনগণ অত্যাচার-নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে নবী করীম (স)-এর নিকট এসে ফরিয়াদ করতেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আর তো সহ্য করতে পারছি না। অনেকে বলতেন, আপনি অনুমতি দিন, আমরা এর মুকাবিলায় ওদেরই মত অস্ত্র ব্যবহার করি। অস্ত্র আমাদেরও আছে আর আমরাও তাঁর ব্যবহার করতে জানি। এ সময় মক্কী সমাজের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে কিছু সংখ্যক মুসলমান হাবশায় (প্রাচীন আবিসিনিয়া বা বর্তমান ইথিওপিয়া) হিজরত করে যায়।

কিন্তু নবী করীম (স) অস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে বিরুদ্ধপক্ষকে প্রতিরোধ করার অনুমতি দেন নি। তিনি তাদেরকে শুধুই 'সবর' অবলম্বন করে অবিচল হয়ে থাকার উপদেশ দিতেন। তার দুটি কারণ সুস্পষ্ট। প্রথম, তখন পর্যন্ত আল্লাহ্র নিকট থেকে অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয়, যে সামাজিক বিপ্লব রাসূলে করীম (স)-এর লক্ষ্য, তাতে প্রথম পর্যায় হচ্ছে প্রশিক্ষণমূলক। উদ্দেশ্য, এমন ব্যক্তিদের গড়ে তোলা, যাঁরা সত্য দ্বীনের প্রতিষ্ঠায় হবেন অবিচল, নির্ভরযোগ্য। বৈষয়িক স্বার্থ বা শত্রুদের নিপীড়ন কোন কিছুই তাদেরকে দ্বীনের মহান আদর্শ থেকে বিরত বা বিচ্যুত করতে পারবে না—আগুনে পোড়া স্বর্ণের খাঁটিত্ব যেমন নিঃসন্দেহে বিশ্বাসযোগ্য, কাঁচা মাটি নির্মিত ইট আগুনে জ্বালিয়ে পরিপক্ক করে তা দিয়ে যেমন পাকা দালান নির্মান করা হয়, এ-ও ঠিক তেমনি।

বস্তুত নবী করীম (স)-এর সামাজিক বিপ্লবের কার্যক্রমের স্বরূপ ছিল নির্ভীক বিপ্লবী ও আদর্শবাদী কর্মী বাহিনী ও অনমনীয় নেতা সৃষ্টির মাধ্যমে দ্বীনি ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা সাধন— নিছক নেতৃত্ব ও ক্ষমতার হাত বদল নয়। আদর্শ তো বিমূর্ত (Abstract)—ভাবমূলক, নির্বস্তুক। তাকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার জন্য সেই ভাবধারার নির্ভরযোগ্য ধারক-বাহক মানুষের প্রয়োজন। আর সে মানুষ এরূপ একটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে পরীক্ষার পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়ে নেয়ার মাধ্যমেই তৈরী করা যেতে পারে। ইতিহাস অকাট্যভাবে সাক্ষ্য দেয়, প্রাথমিক পর্যায়ে ঈমান গ্রহণকারী ব্যক্তিরা বাস্তবতার অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা), তাঁর পিতা ওমা, হাবশী গোলাম হযরত বিলাল (রা), হযরত খাব্বাব ইবনুল ইরত, বনু মুমিনের ক্রীতদাসী লবীনা প্রমুখ প্রথম পর্যায়ের সাহাবীগণ এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁদের কেউ শাহাদত বরণ করেন, আবার কেউ সব সয়েও বেঁচে ছিলেন। এই সময়েই নবী করীম (স) এবং তাঁর সমর্থনকারী বংশের অন্যান্য লোকেরা দীর্ঘ তিনটি বছর পর্যন্ত মক্কার কুরাইশগণ কর্তৃক সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়ে একটি গিরি-গুহায় অবরুদ্ধ থাকতে বাধ্য হন। এ সময়ে তাঁদের সাথে কেউ কোন সম্পর্ক রাখত না এবং কোন দ্রব্যও বিক্রয় করত না। তাঁর চাচা আবু তালিব তাঁকে মুশরিকদের সকল শত্রুতা থেকে আশ্রয় দিতেন। একদিন চাচা বললেন ঃ ভাতিজা, ওদেরকে থামাতে পারছি না। তোমার কাজ বন্ধ করলে ওরা তোমার নেতৃত্ব মেনে নেবে। তখন রাসূল (স) বললেন ঃ ওরা যদি আমার এক হাতে সূর্য এবং অপর হাতে চাঁদও তুলে দেয়, তবুও আমি আমার কাজ করতেই থাকব। তাতে আল্লাহ্ এ কাজে জয়ী করেন কিংবা আমি ধ্বংস হয়ে যাই, তার পরোয়া নেই।[১]

রাসূলে করীম (স)-এর ইসলামী বিপ্লবী আন্দোলনের এক পর্যায়ে তাঁর সম্মুখে প্রলোভনের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। কুরাইশ সরদার উতবা ইবনে রবীয়াকে পাঠিয়ে তাঁর নিকট প্রস্তাব পেশ করা হয় ঃ

> তোমার এ কাজের লক্ষ্য যদি হয় ধন-মাল সংগ্রহ, তাহলে বল, আমরা তোমাকে এত বেশী ধন-সম্পদ দেব যে, তুমি আমাদের সকলের তুলনায় সেরা ধনী ব্যক্তি হয়ে যাবে। যদি তুমি মান-মর্যাদা লাভের ইচ্ছুক হয়ে থাক, তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের সর্বোচ্চ নেতা বানিয়ে নেব। তোমার সিদ্ধান্ত আমরা সকলেই মেনে নেব। আর যদি তুমি বাদশাহ হতে চাও, তা হলে তোমাকে আমাদের বাদশাহ্ বানিয়ে নেব। আর যদি তোমাকে জ্বিন-পরীতে পেয়েছে মনে কর, তাহলে বড় বড় চিকিৎসক দ্বারা তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব।[২]

নবী করীম (স) সব কথা চুপ করে শোনার পর সূরা ফুস্সিলাত (হা-মীম আস্-সিজদা)-এর প্রথম থেকে ৩৮ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করেন। এই আয়াতসমূহে

---

১. السيرة النبوية لابى الحسن على ندوى

২. السيرة النبوية لابى الحسن على ندوى

কুরআনের আল্লাহ্‌র নাযিল করা কিতাব হওয়ার, রাসূলে করীমের আল্লাহ্‌র প্রেরিত সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা হওয়ার, তিনি একজন সাধারণ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নিকট আল্লাহ্‌র ওহী আসার, যারা এই কালাম শোনে না—এর প্রতি ঈমান আনে না, তাদের মর্মান্তিক পরিণতি হওয়ার, যারা ঈমান এনেছে তাদের অপরিসীম শুভ ফল পাওয়ার, এই আসমান-জমিন মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টি হওয়ার, অতীতের যেসব জনগোষ্ঠী আল্লাহ্‌র নবীর দাওয়াত কবুল করেনি, তাদের ওপর এই দুনিয়ায়ই কঠিন আযাব আসার, ঈমানদার লোকদের প্রতি সাহায্যকারী হিসাবে ফেরেশতা নাযিল হওয়ার, সমগ্র বিশ্ব লোকের ওপর একমাত্র আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব হওয়ার এবং কেবল তাঁরই বন্দেগী করার আহ্বান সম্বলিত নানা কথা রয়েছে। নবী করীম (স) কুরাইশদের প্রলোভনকে প্রত্যাখ্যান করলেন। তাঁর যদি ধন-সম্পদের লিপ্সা থাকত, শুধু ক্ষমতা লাভই তাঁর ইচ্ছা হত, ক্ষমতায় আসীন হতে পারলেই তাঁর নিয়ে আসা বিধান বাস্তবায়িত করা সহজ ও সম্ভব হবে বলে যদি মনে করতেন, তাহলে তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতেন না। কিন্তু তা গ্রহণ করলে আর যা-ই হোক, ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হত না। তাঁর রাসূল হওয়াই ব্যর্থ হয়ে যেত।

নবী করীম (স)-এর দাওয়াতের সারকথা ছিল ঃ

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ –

তোমরা সকলে কেবল এক আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

(সূরা শু'আরা ঃ ১০৮)

অন্য কথায়, আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাসূলে করীম (স) এর নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তাঁর অনুসরণ ও অনুগমন কর। অর্থাৎ যে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব সমগ্র বিশ্ব-জগতে সদা কার্যকর, মানুষ সেই আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস ও ভয় করে রাসূলে করীম (স)-এর মাধ্যমে পাওয়া জীবন-বিধান অনুযায়ী আপন জীবন ও সমাজ গঠন করবে, এটাই ছিল তাঁর সামাজিক বিপ্লবের মূল চাবিকাঠি। কেননা মানুষ যতদিন পর্যন্ত এক আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব মেনে না নেবে, ততদিন মানবীয় সমাজের ভিত্তিই রচিত হতে পারে না। ততদিন মানবীয় সার্বভৌমত্বই প্রবল ও প্রধান হয়ে থাকবে; মানুষ থাকবে মানুষের গোলাম হয়ে। আর তা-ই হচ্ছে মানবীয় সমাজের বিপর্যয়ের মৌল কারণ। আল্লাহ্‌কে ভয় করে রাসূলের নেতৃত্ব মেনে না নেয়া পর্যন্ত মানুষ কাফির-ফাসিক ও চরিত্রহীন লোকদের নেতৃত্ব মেনে চলতে বাধ্য হবে আর তা-ই হচ্ছে সমস্ত অকল্যাণের মৌল কারণ। মুসলিম তথা ইসলামী সমাজের নাগরিক হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে তাই সর্বপ্রথম অন্য সব কিছুর প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে এক আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব এবং অন্য সকলের নেতৃত্ব অস্বীকার করে এক রাসূলের নেতৃত্ব মেনে নিতে হয়। তাকে অকৃত্রিম বিশ্বাস সহকারে ঘোষণা করতে হয় ঃ

لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ –

বস্তুত রাসূলে করীম (স)-এর এই বিপ্লবী দাওয়াতই হচ্ছে তাঁর সামাজিক বিপ্লবের মূল প্রকৃতি। যে অবস্থায় সমাজ রয়েছে, তাকে আমূল পরিবর্তনের একমাত্র উপায় হচ্ছে এই বিপ্লবী দাওয়াত। তাঁর এ দাওয়াত প্রতিষ্ঠিত সমাজকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছে, তার অন্তঃসারশূন্যতাকে লোক সমুখে তুলে ধরেছে এবং নতুন সমাজ গঠনের পথ উন্মুক্ত করেছে। এভাবে সর্বদিক দিয়ে নতুন সমাজ গঠনের তাগিদ প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। পুরনো সমাজকে চুরমার করে নতুন সমাজ নির্মাণের এই তাগিদই হচ্ছে সমাজ বিপ্লবের মৌল প্রেরণা।

তওহীদী দাওয়াতের এই প্রাথমিক পর্যায়ের কার্যক্রমের ফলে মক্কা এবং তার আশেপাশের বিভিন্ন গোত্রের বহু সংখ্যক লোকের পক্ষে ইসলাম গ্রহণ সম্ভবপর হয়। ওদিকে হজ্জের মৌসুমে বাইরের গোত্রসমূহের লোকদের পক্ষেও এই তওহীদী দাওয়াত কবুল করার সুযোগ ঘটে। সর্বোপরি মদীনার আওস ও খাজরাজ গোত্রের লোকেরা হজ্জের মৌসুমে মক্কায় এসে এ দাওয়াতের সাথে পরিচিতি হয় এবং তাদেরই পরামর্শে নবী করীম (স) কয়েকজন সুশিক্ষিত সাহাবী পাঠিয়ে মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন।[১] ফলে মক্কা ও মদীনা—তদানীন্তন আরব উপদ্বীপের দুই প্রধান জনবসতিতে দ্বীন-ইসলামের বীজ অংকুরিত হয়ে একটি একক বৃক্ষের রূপ পরিগ্রহ করে। এই বৃক্ষের বলিষ্ঠতা বিধান, তার ছায়া বিস্তার ও সেই ছায়ার তলে নির্যাতিত-নিষ্পেষিত-বঞ্চিত মানবতাকে আশ্রয় দান এবং সেই সাথে তার সুমিষ্ট ফল দুনিয়ার দিকে দিকে ছড়িয়ে থাকা মজলুম ও বঞ্চিত মানবতার নিকট পৌঁছানোর দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে রাসূলে করীম (স) মহান সার্বভৌম আল্লাহ্‌রই নির্দেশক্রমে তাঁর আবাসস্থল পরিবর্তন করেন। তিনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় উপনীত হন। অতপর তাঁর মদীনা-কেন্দ্রিক জীবনে ইসলাম মতাদর্শের পর্যায় থেকে 'বাস্তব' পর্যায়ে উন্নীত হয়। যে তওহীদী আদর্শ তিনি সুদীর্ঘ তেরটি বছর পর্যন্ত মুখে প্রচার করেছেন, যার আলোকে লোকদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, মদীনায় তারই ভিত্তিতে তিনি একটি বাস্তব সমাজ গঠনের কার্যক্রম শুরু করে দেন। ইতিহাসে এই স্থান বদলকেই 'হিজরত' বলা হয়েছে। ইসলামী সমাজ বিপ্লবে হিজরত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। হিজরতের কিছুদিন পূর্বেই আল্লাহ্ রাসূলে করীম (স)-কে তাঁর একান্ত নিজস্ব এলাকায় নিয়ে যান, দেখিয়ে দেন ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের অন্তরালে নিহিত বিশাল অদৃশ্যলোক। সেখান থেকে ফিরে আসার পর পরই সূরা আল-ইস্‌রার (বনী ইসরাইলের) ২৩ থেকে ৩৯ আয়াতে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের ১৪টি মৌলনীতি তাঁকে জানিয়ে দেয়া হয়। এরই ভিত্তিতে রাসূলের করীম (স) মদীনায় ইসলামী সমাজ কার্যত গঠন ও পরিচালনা করেন।

বাস্তব পর্যায়ে ইসলাম

হিজরতের ফলে রাসূলে করীম (স) এবং মক্কা ও আশপাশের এলাকার মুসলমানদেরকে আপন বাড়ীঘর, জমি-জায়গা, ক্ষেত-খামার, ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং

১. السيرة النبوية لابى الحسن على ندوى

অনেককে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ত্যাগ করে সর্বহারা ফকীরের ন্যায় মদীনার মত এক ক্ষুদ্র পরিসর বসতিতে উপস্থিত হতে হয়। এখানে তাদের ছিল না আহার বাসস্থান ও আয়-উপার্জনের কোন নিজস্ব ব্যবস্থা। মদীনার বাসিন্দা মুসলিমগণ মুহাজির মুসলিমদের উদারভাবে গ্রহণ করলেন, তাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণেরও ব্যবস্থা করে দিলেন।

নবী করীম (স) মদীনায় উপস্থিত হয়ে পরপর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিলেন। সর্বপ্রথম তিনি মসজিদ নির্মাণের ব্যবস্থা করলেন। কেননা এই মসজিদই হচ্ছে ইসলামী সমাজের মিলন-কেন্দ্র, ইসলামী সমাজ বিপ্লবের বাস্তব ভিত্তি। দ্বিতীয়, তিনি মুহাজির ও মদীনার মুসলিম আনসারদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করলেন।[১] এই ভ্রাতৃত্বই হল ইসলামী সমাজ ও জাতি গঠনের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর।

এই ভ্রাতৃত্ব বংশ, বর্ণ, ভাষা, গোত্র ও স্থানের ভিত্তিতে রচিত হয়নি। কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'র প্রতি ঈমানের সূত্রে গ্রথিত করেই এই নতুন আদর্শবাদী জাতীয়তা রচিত হল। তাতে সুহাইব রুমী, বিলাল হাবশী ও সালমান ফারসী, মক্কার কুরাইশ, আশেপাশের ঈমানদার এবং মদীনার আওস ও খাজরাজের লোকেরা সমান মর্যাদা ও অভিন্ন অধিকার লাভ করলেন। এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান ও রাসূল (স)-এর নেতৃত্ব অনুসরণে বিভিন্ন গোত্র, বংশ, দেশ, বর্ণ ও ভাষার লোকেরা একাকার হয়ে গেল। নাযিল হল আল্লাহ্র ঘোষণা ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ – وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ – هُوَاجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ ط هُوَسَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ لا مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ –

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা মাথা নত কর, সম্পূর্ণ রূপে আত্মসমর্পিত হও এবং গোলাম হয়ে যাও তোমাদের রব্ব-এর। আর সর্ব প্রকারের কল্যাণময় কাজে তৎপর হও। খুবই আশা করা যায়—তোমরা সাফল্য লাভ করবে। আর জিহাদ কর আল্লাহ্র পথে, তাঁর জন্য জিহাদ করা যেমন দরকার। তিনিই তোমাদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন। দ্বীন পালনে তোমাদের ওপর কোন অসুবিধা চাপিয়ে দেন নি। এ তো তোমাদের পিতা ইবরাহীমের আদর্শ পথ। তিনিই তো তোমাদেরকে মুসলিম নামে অভিহিত করেছেন—পূর্বে যেমন, এই গ্রন্থেও তেমনি, যেন রাসূল হয় তোমাদের পথ-প্রদর্শক আর তোমরা পথ-প্রদর্শক হবে সমগ্র মানুষের।[২]

(সূরা হজ্জ ঃ ৭৭ ও ৭৮)

---

১. السيرة النبوية لابى الحسن على الندوى

২. তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ-এর প্রাথমিক আলোচনা।

হিজরতের অব্যবহিত পরে নাযিল হওয়া কুরআন মজীদের এই আয়াতে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নেতৃত্বে সংগঠিত হওয়া জনগণকে মুসলিম ও ইবরাহীমী মিল্লাত অর্থাৎ 'তওহীদের আদর্শানুসারী জনগোষ্ঠী' পরিচিতিতে অভিহিত করা হয়েছে। এভাবে পুরানো সমাজের ধ্বংসাবশেষের ওপর গড়ে উঠল এক নতুন সমাজ। পুরানো সমাজ ছিল আদর্শহীন, চরিত্রহীন ও নেতৃত্বহীন। নতুন সমাজ তওহীদী আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ও সর্ব কাজে দ্বীন-ইসলামের অনুসরণই এ সমাজের চরিত্র। এ সমাজের অবিসংবাদিত নেতা হচ্ছেন আল্লাহ্‌র শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী-রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)। পুরানো সমাজের চূড়ান্ত বিলুপ্তি ও সে সমাজ-নেতৃত্বের চির অবসান এখন শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র।

রাসূলে করীম (স) তৃতীয় যে কাজটি করেন, ঐতিহাসিকগণ 'মদীনা সনদ' নামে তার উল্লেখ করেছেন। তাতে মুহাজির ও আনসারদের সাথে সাথে মদীনার প্রাচীন ও অত্যন্ত প্রভাবশালী ইয়াহুদীদের নাগরিক মর্যাদা, নাগরিক অধিকার ও দায়-দায়িত্ব এবং পারস্পরিক সম্পর্ক সুস্পষ্ট ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়। এর মাধ্যমে মদীনার সমাজে মুসলিম প্রাধান্য ও হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নিরংকুশ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।[১]

মদীনার প্রাচীন অধিবাসী আওস, খাজরাজ ও ইয়াহুদী জনগণ আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে নিজেদের বাদশাহ বানাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। নবী করীম (স) ও মুসলমানদের মদীনায় উপনীত হওয়ার পূর্বে তাকে বাদশাহরূপে বরণ করার জন্য মুকুটও তৈরী হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে হঠাৎ করে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক মুসলিমের সমাবেশ হওয়ায়—সর্বোপরি মদীনার লোকদের দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করায় তাদের সে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত একেবারে বানচাল হয়ে যায়।[২] এর পরিবর্তে সেখানে নবী করীম (স)-এর নেতৃত্বে এক পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ গড়ে উঠে আর তাতে ইয়াহুদীরা সংখ্যালঘু অমুসলিম নাগরিকের অধিকার পেয়ে বসবাস করতে বাধ্য হয়। রাসূলে করীম (স)-এর কায়েম করা এ সমাজে সার্বভৌমত্ব কার্যকর ছিল একমাত্র আল্লাহ্‌র; নেতৃত্ব ছিল রাসূলে করীম (স)-এর। সেখানে সব নাগরিক ছিলেন আল্লাহ্‌র কুরআন ও রাসূলের সুন্নাতের অনুসারী। তাঁরা ছিলেন খালেসভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌র বান্দা। আর এ-ই হচ্ছে প্রকৃত ইসলামী সমাজের বাস্তব রূপ।

ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত পর্যায়

রাসূলে করীম (স) মদীনায় অবস্থান গ্রহণ এবং সেখানে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পরও বায়তুল মাকদিসকে কিবলা বানিয়ে নামায পড়তেন। কিন্তু মদীনাকে কেন্দ্র করে ইবরাহীমী মিল্লাতের প্রতিষ্ঠা লাভের পর বায়তুল মাকদিসের পরিবর্তে হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক নির্মিত কা'বারই কিবলা হিসেবে নির্ধারিত হওয়া ছিল খুবই পসন্দনীয় এবং প্রয়োজনীয়। রাসূলে করীম (স)-এর মাদানী জীবনের

---

১. تاريخ اسلام السياسي والدين والثقافي والاجتماعي

২. السيرة النبوية لابي الحسن على الندوى ص ১৫৭

মোট ষোল মাস পর আল্লাহ্ তা'আলা বায়তুল মাকদিসের পরিবর্তে কা'বাকে কিবলা বানিয়ে ওহী নাযিল করেন ঃ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَحَيْثُ مَاكُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ -

অতপর হে নবী! তুমি তোমার মুখ মাসজিদুল হারামের (কা'বা) দিকে ফিরাও। আর হে মুসলিমগণ! তোমরা যেখানে থাকনা কেন, তোমাদের মুখমণ্ডল সেই দিকে ফিরাও। (সূরা বাকারা ঃ ১৪৪)

বস্তুত এ শুধু কিবলা পরিবর্তনের ঘোষণা নয়। এ হচ্ছে সমগ্র আরব তথা বিশ্বের নেতৃত্বে আমূল পরিবর্তনের ঘোষণা। এর পূর্ব পর্যন্ত ইয়াহূদী ও খৃস্টানরাই বিশ্বনেতৃত্বে আসীন ছিল। আর তখন পর্যন্ত ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের কিবলা মুসলমানদেরও কিবলা ছিল; কিন্তু এবার মুসলমানদের কিবলা হয়ে গেল কা'বা—মসজিদুল হারাম। তার অর্থ, ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের বিশ্বনেতৃত্ব নিঃশেষ হয়ে গেল। অতপর রাসূলে করীম (স) এবং তাঁর নেতৃত্বের অনুসারী মুসলমানদেরই বিশ্বনেতৃত্বের আসনে সমাসীন হওয়ার সিদ্ধান্ত আল্লাহ্র নিকট থেকেই হয়ে গেল। তিনি আয়াত নাযিল করে তাঁর ঘোষণা দিলেন এ ভাষায় ঃ

وَكَذَالِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا -

এমনিভাবেই—হে মুসলিম সমাজ! তোমাদেরকে উত্তম ও কেন্দ্রস্থানীয় উম্মত বানালাম, যেন তোমরা সমগ্র মানুষের পথ-প্রদর্শক হতে পার এবং রাসূল হন তোমাদের পথ-প্রদর্শক।

অর্থাৎ তোমরা একই আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত জনসমাজ। তোমাদের সেই অভিন্ন আদর্শ ইসলাম। রাসূল (স) তোমাদের নেতৃত্ব দান করছেন। তোমরা তাঁরই নেতৃত্বে সংগঠিত আর এ কারণেই তোমরা বিশ্বমানবের নেতৃস্থানীয় হয়ে গেছ।

ফলকথা, রাসূলে করীম (স)-এর নেতৃত্ব অনুসরণ করতে থাকলেই তোমরা সর্বোত্তম ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ের জনগোষ্ঠী হয়ে থাকবে। আর রাসূলের নেতৃত্ব অনুসরণ পরিহার করলে তোমরা বিশ্বনেতৃত্বের আসন থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে, সর্বোত্তম জনগোষ্ঠী হওয়ার অধিকারও থাকবে না তোমাদের। তখন তোমরা এক বিভ্রান্ত ও আদর্শবিচ্যুত জনতার ভিড়ে পরিণত হবে। তোমরা হবে অন্যান্য জাতি কর্তৃক নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও পদদলিত।

বর্তমান মুসলিম জাতির বাস্তব অবস্থা আয়াতটির সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণ করছে। সেই সাথে তা এই শিক্ষা দিচ্ছে যে, তোমরা যদি আবার রাসূলে করীম (স)-এর

নেতৃত্বের অনুসারী জনগোষ্ঠীতে পরিণত হতে পার, রাসূল কার্যতই তোমাদের জীবনে অনুসৃত হন, তাহলে তোমরা আবার সর্বোন্নত জনগোষ্ঠীতে পরিণত হতে পারবে। তোমরা আবার বিশ্বমানবের নেতৃত্বের আসনে সমাসান হতে পারবে।

রাসূলে করীম (স) সৃষ্ট সামাজিক বিপ্লবের বিশেষত্ব

আরব উপদ্বীপে রাসূলে করীম (স) সৃষ্ট সমাজ বিপ্লব শুধু আরব দেশীয় বিপ্লব ছিল না, তা ছিল বিশ্ব-বিপ্লবেরই সূচনা ও প্রথম পর্যায় মাত্র। হযরত মুহাম্মাদ (স) কেবল মাত্র আরব দেশের জন্যই প্রেরিত হন নি, কেবল আরবদেরই নবী ছিলেন না তিনি। তিনি ছিলেন বিশ্বনবী। সমগ্র বিশ্বে তওহীদী বিপ্লব সৃষ্টিই ছিল তাঁর সম্মুখবর্তী কাজ। তিনি নিজে দৈহিকভাবে জীবিত থেকে সমগ্র বিশ্বে কার্যত বিপ্লব সৃষ্টি করে যান নি একথা সত্য, কিন্তু আরব দেশের সীমিত পরিসরে যে আদর্শিক ও ঈমানী বিপ্লব তিনি সৃষ্টি করে গেলেন, তা বিশ্ব–বিপ্লবেরই পূর্বাভাস এবং তারই সূচনা। তওহীদী আকীদার ভিত্তিতে যে সমাজ বিপ্লবের পথ তিনি দেখিয়ে গেছেন, তা-ই বিশ্ব সমাজে আদর্শিক বিপ্লব সৃষ্টির দিগদর্শন। সে বিপ্লবের তরঙ্গাভিঘাত দুনিয়ার দেশে দেশে দেশভিত্তিক বিপ্লব সৃষ্টি করতে থাকবে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সমগ্র বিশ্বে সেই তওহীদী বিপ্লব সংঘটিত হয়ে বিশ্ব-বিপ্লবের কাজ সম্পূর্ণতা লাভ করবে। এটা শুধু অন্ধ আকীদার ব্যাপার নয়। এর বাস্তব লক্ষণ দুনিয়ার দিকে দিকে এখনই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রাসূলে করীম (স) আরব উপদ্বীপ–কেন্দ্রিক যে বিপ্লবটা করে গেছেন, দুনিয়ার সমাজ ও রাষ্ট্র বিপ্লবের ইতিহাসে তা এক দৃষ্টান্তহীন ঘটনা। সাধারণত ফরাসী বিপ্লবকে দুনিয়ার সর্বপ্রথম সুসংগঠিত ও পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব মনে করা হয়। কিন্তু আমি বলব, ফরাসী বিপ্লব কোন সুসংগঠিত বিপ্লব ছিল না—ছিল না কোন পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব । তা সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিতও ছিল না; পূর্বে সে জন্য কোন কর্মসূচী রচিত ও গৃহীত হয়নি। সে বিপ্লবের কোন নেতাও নির্বাচিত ছিল না। ফলে ফরাসী বিপ্লব শুধু রাজতন্ত্র উৎখাতকারী একটি ঘটনা রূপে চিহ্নিত হয়েছে, সামষ্টিক জীবনে কোন স্থায়ী কল্যাণ সৃষ্টি করা সেই বিপ্লবের পক্ষে সম্ভব হয়নি। পক্ষান্তরে ১৯১৭ সনের রুশ বিপ্লব ছিল ব্যাপক জনগণের সমর্থনহীন মুষ্টিমেয় রাজনৈতিক কর্মী ও সেনা বাহিনীর বিপ্লব; জোরপূর্বক কমিউনিজম চাপিয়ে দেয়ার বিপ্লব। সে বিপ্লবের ফলে পুরোনো জার-এর পরিবর্তে নতুন এক জারের দুঃশাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে; মানবতা যে নিপীড়নে জর্জরিত ছিল জার শাসনে, নতুন কমিউনিস্ট শাসনে তার চাইতেও অধিক নিষ্পেষন ও নির্যাতনের শৃংখলে আবদ্ধ হয় সে দেশের মানুষ। যে কমিউনিজমের কথা বলা হয়েছিল বিপ্লবের সময়, তা সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত মুহূর্তের তরেও কার্যকর বা বাস্তবায়িত হয়নি পৃথিবীর কোথাও।

কিন্তু আরব উপদ্বীপে খৃস্টীয় সপ্তম শতকে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়, তা ছিল তওহীদী আকীদা-ভিত্তিক এক পূর্ণাঙ্গ আদর্শবাদী বিপ্লব এবং সে বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছেন রাসূলে করীম (স)। সেই বিপ্লব ক্রমিক পদ্ধতিতে সূচিত ও বাস্তবায়িত হয়। তা ছিল শিক্ষামূলক, জ্ঞানসমৃদ্ধ এবং গঠনমূলক (Constructive)। প্রভাত সমীরণের ন্যায় তা

সূচিত হয়ে ক্রমশ প্রবল ও প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে। নতুন চাঁদ আকাশের ভালে হাঁসুলির মত উদিত হয়ে আবর্তনের ধারায় যেমন পূর্ণ শশীতে পরিণত হয়, ঠিক তেমনি এই বিপ্লবের মৌল চিন্তা, পূর্ণ আদর্শ ও কর্মনীতি ও পদ্ধতি কোন এক ব্যক্তির চিন্তার ফসল ছিল না। তা ছিল সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র দেয়া। তাই চিরন্তনতা তার বিশেষত্ব। এ বিপ্লবের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিপ্লবের প্রথম দিন থেকে জ্ঞানচর্চার যে কার্যক্রম শুরু হয়েছিল, তা শেষ দিন পর্যন্ত চলেছে। এখনও তা সেই জ্ঞানচর্চার কারণে শাশ্বত হয়ে আছে। এই বিপ্লব চলাকালে মাঝে-মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহও দেখা দিয়েছে। বিপ্লবকে সম্পূর্ণতা দানের জন্য প্রতিরোধক শক্তিসমূহের বিষদাঁত চূর্ণ করাই ছিল তার তাৎক্ষণিক প্রয়োজন। সে প্রয়োজন চিরদিনই থাকবে। কিন্তু তা মূলত ধ্বংসাত্মক (Destructive) নয়, গঠনমূলকতাই তার মৌল ভাবধারা।

এই বিশেষত্বের কারণে বিপ্লবের পূর্ণত্ব প্রাপ্তির সাথে সাথে সমগ্র আরব উপদ্বীপ একটি আদর্শের ধারক ও বাহকে পরিণত হয়। বিপ্লবের বাণী অতি অল্প সময়ের মধ্যে তদানীন্তন পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে ও বিশ্ব-বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যায়। পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ানো শক্তিগুলোকে পেঁজা তুলার মত উড়িয়ে দেয়া হয়। পূর্ণত্বের সামনে অপূর্ণত্ব এসে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নেতৃত্বে সংঘটিত এ বিপ্লব ছিল রব্বানী বিপ্লব; আল্লাহ্‌র একমাত্র রব্ব—মালিক, আইনদাতা, বিধানদাতা ও লালন-পালনকারী হওয়ার আকীদা-ভিত্তিক বিপ্লব; মানুষকে মানুষের মালিকত্ব, আইন-বিধানের কর্তৃত্ব ও লালন-পালনকারিত্ব থেকে মুক্তিদানের বিপ্লব। তাই ইসলামী বিপ্লবের মৌল ধারণায় এই বিশ্বাস চিরজাগরূক যে, সবকিছুর মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্, সার্বভৌমত্ব নিরঙ্কুশভাবে তাঁরই। মানুষের ওপর আইন বিধান চলবে একমাত্র তাঁরই—যা রাসূলে করীম (স)-এর মাধ্যমে নাযিল ও বাস্তবায়িত হয়েছে—এবং দুনিয়ার যাবতীয় ধন-সম্পদে সকল মানুষের সমান অধিকার। প্রয়োজনীয় অংশ প্রাপ্তি থেকে কোন একটি মানুষও বঞ্চিত থাকবে না। রাসূলে করীম (স)-এর নেতৃত্বে সংঘটিত বিপ্লবে মানুষ নির্বিশেষে মর্যাদা ও অধিকার পেয়েছে, পূর্ণ মাত্রায় বাস্তবায়িত হয়েছে তওহীদী আদর্শ।

এ বিপ্লবেরই প্রয়োজন দুনিয়ার মানুষের জন্য। সেই প্রয়োজন যেমন তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশ বছর পূর্বে, তেমনি আজকের দিনেও সেই প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। সর্বপ্রকারের আদর্শের, ইজমের ও বিপ্লবের চরম ব্যর্থতার পর এই বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা আরও অধিক তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। বর্তমান অশান্তিময় পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি আসতে পারে কেবল এই বিপ্লবের মাধ্যমেই।

শেষ কথা

রাসূলে আকরাম (স)-এর তেইশ বছরের নবুয়্যাতী জীবন এক কূল-কিনারাহীন মহাসমুদ্র। তাকে কোন সংক্ষিপ্ত আলোচনার সীমার মধ্যে বন্দী করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তবে মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট বিষয়টি আধুনিক দৃষ্টিকোণে বুঝবার জন্য যে মূল

কথাগুলো সামনে নিয়ে আসা দরকার, তা এর মধ্যে রয়েছে বলে আমি মনে করি। এর আলোকে অন্তত ছিদ্র দিয়ে বিশ্বলোক দর্শনের ন্যায় কিছুটা চিন্তার খোরাক এ আলোচনায় পাওয়া যেতে পারে—এ বিশ্বাস আমার আছে।

এ আলোচনার সর্বশেষ কথা হিসাবে আমি বলতে চাই, রাসূলে করীম (স) তদানীন্তন গোটা আরব উপদ্বীপ ও সমগ্র বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত জাহিলিয়াতকে উৎখাত করে আল্লাহ্‌র পূর্ণ দ্বীনকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করার কাজ করেছেন। এই কাজের প্রক্রিয়া হিসেবে তিনি সেই জাহিলিয়াতের চালু করা কোন পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। ইসলামী সমাজ বিপ্লবের জন্য তিনি সম্পূর্ণ ও খালেস ইসলামী প্রক্রিয়া ও উপায়ই অবলম্বন করেছেন। সে প্রক্রিয়াই একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা ও আদর্শভিত্তিক বিপ্লব সৃষ্টির স্বভাবসম্মত ও বিজ্ঞান সমর্থিত প্রক্রিয়া।

আজও যদি আমরা ইসলামী সমাজ বিপ্লব সৃষ্টির জন্য কাজ করতে চাই, তাহলে আ-মাদেরও মৌলিকভাবে সেই প্রক্রিয়াকেই অবলম্বন ও অনুসরণ করতে হবে। জাহিলিয়াত দ্বারা জাহিলিয়াত উৎখাত করা সম্ভব নয়, জাহিলিয়াতের প্রবর্তিত নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমেও সম্ভব নয় ইসলাম কায়েম করা। ইসলাম কেবল তার নিজস্ব প্রক্রিয়ারই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে; বরং জাহিলিয়াত প্রবর্তিত পন্থার মাধ্যমে, আরও সুস্পষ্ট ভাষায় বললে, তথাকথিত গণতান্ত্রিক পন্থার নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলাম কায়েমের করতে চেষ্টা করা ইসলামের সাথে শত্রুতা করারই শামিল।

আমি সুধী পাঠকবৃন্দকে রাসূলে করীম (স)-এর 'সুন্নাত' অনুসরণ করে আমাদের এই বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার বিপ্লবাত্মক কার্যক্রম তথা জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য আকুল আহ্‌বান জানাই।

বিশ্বমানবতার প্রতি বিশ্বনবীর শাশ্বত অবদান

ধর্ম ও রিসালাতের ইতিহাসে অনন্য ঘোষণা

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ -

এবং আমরা তোমাকে হে রাসূল, সমগ্র বিশ্বলোকের জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছি।
(আল-আম্বিয়া ঃ ১০৭)

বস্তুত ধর্ম ও রিসালাতের ইতিহাসে এ এক অনন্য ও দৃষ্টান্তহীন ঘোষণা। এই ঘোষণায় হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে সমগ্র বিশ্বলোক ও তার মধ্যে অবস্থিত সবকিছুর জন্য আল্লাহ্‌র একমাত্র 'রহমত' বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার শাশ্বত কালাম কুরআন মজীদে এই চূড়ান্ত ঘোষণা বিধৃত। আর কুরআন মজীদ বিশ্ব-মানবের অধ্যয়নের চিরন্তন গ্রন্থ। দুনিয়ার সংখ্যাতীত মানুষ এই কালাম দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা তিলাওয়াত করছে। এই কুরআনের সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই গ্রহণ করেছেন।

যুগ, কাল ও শতাব্দীর সীমাহীন প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র এই ঘোষণা যেমন অসাধারণ, তেমনি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী ও দৃষ্টান্তহীন। কাল, বংশ ও ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ের পরিবেষ্টনী থেকে মুক্ত হয়েই আল্লাহ্‌র এই অনন্য ঘোষণার তাৎপর্য ও যথার্থতা অনুসন্ধান করতে হবে। কেননা বিশ্বনবীর অবস্থান স্থান-কাল-বংশের সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতার বহু উর্ধ্বে। আল্লাহ্‌র এই ঘোষণায় হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে কেবলমাত্র আরব উপদ্বীপ, প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কিংবা কোন বিশেষ মহাদেশের অথবা বিশেষ জাতি-গোষ্ঠী-বর্ণ-গোত্রের অথবা বিশেষ কোন যুগের জন্য রহমত বলা হয়নি। বলা হয়েছে, তিনি সর্বকালের সমগ্র বিশ্বলোকের জন্য রহমত।

সত্যি কথা, এই ঘোষণার ব্যাপকতা, বিশালতা, উচ্চতা, বিরাটত্ব ও মহত্ত্ব এবং চিরন্তনতা অনস্বীকার্য। বিশ্বের ঐতিহাসিক ও দার্শনিকগণ এই ঘোষণার যথার্থতা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে। গোটা মানবীয় মেধা-চিন্তা ও প্রতিভা-মনীষা এই ঘোষণার ফলে বিস্মিত, স্তম্ভিত। কেননা দুনিয়ার ধর্মমতসমূহে, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও দর্শনের ইতিহাসে, সংস্কারমূলক আন্দোলন ও বিপ্লবী তৎপরতার বিবরণে এরূপ বিশ্ব-ব্যাপক ও সর্বজনীন ঘোষণার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। প্রাচীন নবী-রাসূলগণের ক্ষেত্রেও এরূপ কোন ঘোষণার উল্লেখ নেই। কারো সম্পর্কেই এরূপ ঘোষণা কোন ধর্মগ্রন্থে, কোন জীবন চরিতে কোন ব্যক্তি বা জনসমষ্টির জন্য কোন দিনই উচ্চারিত হয়নি।

ধর্মের পর্যায়ে ও ধারাবাহিকতায় ইয়াহুদী ধর্ম প্রাচীনতম। তাতে স্বয়ং আল্লাহ্‌কে বনী

ইসরাঈলের 'রব্ব' বলে পরিচিত করা হয়েছে। বাইবেলের 'পুরাতন নিয়ম' অংশে 'রাব্বুল আলামীন'—সমগ্র বিশ্বলোকের রব্ব বলে স্বয়ং আল্লাহ্‌কেও পরিচিত করা হয়নি। তাই পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের মধ্যে কারো জন্যই এই ধরনের কোন ঘোষণার সন্ধান করা নিতান্তই অর্থহীন।

খৃস্টধর্মের গ্রন্থ 'নতুন নিয়মে' হযরত ঈসা (আ) নিজেকে কেবলমাত্র বনী ইসরাঈলের বিভ্রান্ত লোকসমষ্টিকে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য প্রেরিত বলে পরিচিত করেছেন। নির্বিশেষে সমগ্র মানবতার প্রতি তাঁর কোন বক্তব্যই উদ্ধৃত হয়নি। হিন্দু ধর্মের গ্রন্থাবলীতে বড় বড় ব্যক্তিত্বের উল্লেখ রয়েছে বটে, কিন্তু তাঁরা কেউই বনী ইসরাঈলের নবী-রাসূল থেকে ভিন্নতর কোন বিশেষত্বের দাবিদার ছিলেন না। বিশেষত ব্রাহ্মণ্য ধর্মে নির্বিশেষে সর্বসাধারণ মানুষের কোন স্থান নেই। তারা সকল প্রকার মানবিক মর্যাদা ও অধিকার থেকে জন্মগতভাবেই বঞ্চিত বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। মনু শাস্ত্রে বলা হয়েছে, নীচ জাতের লোকদেরকে খোদা কেবলমাত্র উচ্চ জাতের লোকদের দাসত্ব করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন।

প্রাচীন ভারতের লোকেরা হিমালয়ের বাইরের জগত এবং মানুষ সম্পর্কে কিছুই জানত না। বহির্জগতের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক বা যোগাযোগই ছিল না। বাইরের মানুষ সম্পর্কে জানার কোন আগ্রহও তাদের ছিল না। কাজেই এখানে প্রেরিত কোন মহাপুরুষকে বিশ্বের রহমত বলার প্রশ্নই ওঠে না।

বিশ্বনবীর বিশ্ব রহমত হওয়ার তাৎপর্য

কোন বস্তুর সঠিক মূল্যায়ন দুটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে হতে পারে। একটি তার পরিমিতি আর দ্বিতীয়টি তার অন্তর্নিহিত স্থান, বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব। হযরত মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে কুরআনের উপরোদ্ধৃত ঘোষণা এই উভয় দিক দিয়েই বিবেচ্য। কেননা তাঁর মহান ব্যক্তিত্ব ও তাঁর উচ্চমানের শাশ্বত শিক্ষা ও আদর্শ মানব জীবনে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সূচিত করেছিল, নবতর দিগদর্শন ও কর্ম তৎপরতার সূচনা করে দিয়েছিল, মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের যাবতীয় রোগের পূর্ণ নিরাময়তার কার্যকর ব্যবস্থা করেছিল, মানব জীবনের সার্বিক সমস্যা ও জটিলতার চূড়ান্ত সমাধান দিয়েছিল; মানুষের সকল দুঃখ-দুর্দশা, অভাব-অনটন, নির্যাতন-নিষ্পেষণ ও বঞ্চনার অবসান ঘটিয়েছিল। মানুষের ওপর প্রকৃতভাবেই রহমত ও বরকতের ধারা ব্যাপকভাবে বর্ষিত হয়েছিল। তা যেমন পরিমিতির (Quantity) দিক দিয়ে অত্যন্ত বিরাট ও ব্যাপক, তেমনি সার্বিক কল্যাণ, বিশেষত্ব ও মানগত অবস্থার (Quality) দিক দিয়েও তা ছিল তুলনাহীন— অসাধারণ।

'রহমত' শব্দটি সাধারণভাবে কল্যাণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। মানুষের যে কোন প্রকারের কল্যাণই তার অন্তর্ভুক্ত। তার মাত্রা ও মানের কোন সীমাবদ্ধতা বা নির্দিষ্টতা নেই। তার কোন বিশেষ ধরন বা রূপও নেই। তবে মানুষের সবচেয়ে বড় কল্যাণ হচ্ছে তাকে (মানুষকে) বাঁচতে দেয়া, বাঁচার অধিকার ও বাঁচার উপকরণাদির বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ।

শিশু সন্তান মরনোন্মুখ হয়, পিতামাতা সন্তানের অবস্থা দেখে আর্ত চিৎকারে আকাশ-বাতাস মথিত করে, তখন যেমন আল্লাহ্র রহমতের ফেরেশতা নাযিল হয়, তেমনি আসে সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকও। তখন ব্যবস্থাপনা ও ওষুধ-পথ্যাদির ব্যবহারে মুমূর্ষ শিশু বেঁচে উঠে। তখন বলা হয়, রহমতের ফেরেশতা এসে শিশুটিকে বাঁচিয়েছে। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আগমন বিশ্বমানবতার জন্য অনুরূপ রহমত ছাড়া আর কিছুই নয়।

কেননা তিনি বিশ্বমানবতাকে চূড়ান্ত ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছেন, রক্ষা করার সর্বাধিক কার্যকর পথ-নির্দেশ ও জীবন-বিধান দিয়েছেন। একজন মানুষের মৃত্যু একটি ধ্বংস নিঃসন্দেহে; কিন্তু তার চাইতেও অনেক বড় ধ্বংস হচ্ছে গোটা মানব সমষ্টির ধ্বংস। এ দুটি ধ্বংসের মধ্যে যে পার্থক্য, তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। মহাসমুদ্র ব্যক্তিদেরকেই গ্রাস করে না, অসংখ্য জাতি, জনসমষ্টি, জনবসতি, শহর-নগর গ্রামকেও গ্রাস করে নেয়। বহু সভ্যতা ও সংস্কৃতির পাদপীঠকে হজম করে ফেলে। এরূপ এক সর্বগ্রাসী মহাসমুদ্রের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় নির্ধারণ মানবতার জন্য এক তুলনাহীন অবদান, সন্দেহ নেই।

দুনিয়ার মানুষের মধ্যে যারা জ্ঞানের বিস্তার করেছেন, বিশ্বমানবতা তাদের প্রতি অবশ্যই চিরকৃতজ্ঞ। কিন্তু মানুষের যেসব জ্ঞানের দুশমন চতুর্দিকে ওঁৎ পেতে বসে আছে, যে কোন মুহূর্তে হিংস্র শ্বাপদের মত তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলতে পারে, সেসব থেকে মানুষকে রক্ষা করার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই তার প্রতি সবচাইতে বেশী ও বড় অনুগ্রহ।

এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, এই বিশ্বলোকের একমাত্র স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক সম্পর্কে অজ্ঞতা, তাঁর মহান ও পবিত্র গুণাবলীর ব্যাপারে অনবহিতি এবং মানুষের ওপর তাঁর অধিকার ও ইখতিয়ার সম্পর্কে মূর্খতা সর্বগ্রাসী মহাসমুদ্রের তুলনায়ও অধিক ভয়াবহ ও মারাত্মক। আর এই অজ্ঞতা-অনবহিতি ও মূর্খতার অনিবার্য পরিণতিতে শির্ক, কুসংস্কার ও প্রতীক-পূজার অবাঞ্ছিত জঞ্জালের তলায় নিষ্পেষিত হতে থাকা বিশ্বমানবতার পক্ষে চরমভাবে অবমাননাকর। কেননা তা মনুষ্যত্বের অপমান যেমন, মানুষের উচ্চতর মর্যাদারও অপমান ঠিক তেমনই।

'জড়' ও জঠরের দাসত্ব, সীমালংঘন, মর্যাদাহীনতা এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার নির্বিচার চরিতার্থতা মানুষকে নিতান্তই জন্তুতে পরিণত করে। আর মানবাকৃতির এই জন্তুগুলো সমগ্র সৃষ্টির জন্য অত্যন্ত ভয়ংকর হয়ে দাঁড়ায়। অথচ মানুষের মনুষ্যত্বই যদি রক্ষিত না হয়, তাহলে মানব জন্মই একটা মস্তবড় কলংক। এ কলংক শুধু মানব জাতির জন্য হয় না, হয় গোটা সৃষ্টিলোকের জন্য।

এই মহাসত্যকে সামনে রেখেই মহান সৃষ্টিকর্তা বিশ্বলোক ও মানবতার জন্য রহমতের অবারিত দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন ভূপৃষ্ঠের ওপর মানুষের প্রথম অবস্থিতি ও পদচারণার দিনই। সাধারণভাবে নবী-রাসূল পাঠানো এবং বিশেষভাবে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপস্থিতি সেই অসীম রহমত ও কল্যাণ বিধানেরই

ধারাবাহিকতা [সূচনায় রয়েছে আদি পিতা হযরত আদম (আ)] আর এই ধারাবাহিকতার সর্বশেষ 'কড়ি' হচ্ছেন শেষ দিন পর্যন্তকার জন্য আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)। এ পর্যায়ে নদীপথে চলমান নৌকার মাঝি ও আরোহীদের কথোপকথনের বিখ্যাত উপকথাটি অবশ্যই স্মরণীয়।[১]

বস্তুত বিশ্বমানবতার প্রতি নবী-রাসূলগণের সবচাইতে বড় অবদান হচ্ছে—তাদেরকে অজ্ঞানতার কূল-কিনারাহীন মহাসমুদ্রে ডুবে মরা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাঁতার কেটে বেঁচে থাকা ও সম্পূর্ণ নিরাপদে বেলা ভূমে পৌছে যাওয়ার উপযোগী জ্ঞান দান। সকল কালের মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নবী-রাসূলগণ প্রদত্ত শিক্ষার মধ্যে এ পার্থক্যটাই বিদ্যমান। জীবনের মহাসমুদ্রে নিমজ্জমান অবস্থায় ভেসে থাকা ও সাঁতার কেটে কেটে কিনারায় পৌছে ধ্বংস থেকে বেঁচে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান মানুষ কেবলমাত্র তাঁদের মাধ্যমেই লাভ করেছে। আর সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) কিয়ামত পর্যন্তকার সর্বসাধারণ মানুষকে সেই মুক্তির শাশ্বত পথই দেখিয়ে গেছেন। এ কারণে তাঁর নবুয়্যাত ও রিসালাত চিরন্তন ও সর্বজনীন।

বিশ্বমানবতার ইতিহাস প্রমাণ করে—মানুষের নৈতিকতা ও চরিত্র ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দরুন এবং মনুষ্যত্ব বিধ্বংসী কার্যাবলীর কারণে মানব সমাজের জীবন-তরী যখনই নিমজ্জমান হয়েছে, ঠিক তখনই নবী-রাসূলগণ এসে সে তরীর হাল ধরেছেন শক্ত হাতে এবং পর্বত-সমান উঁচু তরঙ্গমালার ওপর দিয়ে ভাসিয়ে তাকে কিনারার দিকে নিয়ে গেছেন অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে। এদিক দিয়ে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর অবদান যেমন ব্যাপক, সর্বাত্মক, তেমনি অত্যন্ত গভীর ও অধিক সম্প্রসারিত। তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা সকল কালের, সকল বংশের, সকল দেশের ও বর্ণের মানুষের জন্যই সর্বাধিক কল্যাণবহ।

যে সময়ে বিশ্বনবী (স) দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছিলেন, সেই যুগটি ইতিহাসে 'জাহিলিয়াতের যুগ' বলে চিহ্নিত হয়েছে। এই যুগটি কেবলমাত্র সামষ্টিক বা নৈতিক পতনের যুগই ছিল না, শুধু পৌত্তলিকতা বা জুয়া খেলায় মত্ত হয়ে থাকার যুগই ছিল না, নিছক জুলুম ও স্বৈরতন্ত্রের যুগই ছিল না, অর্থনৈতিক শোষণ লুণ্ঠনেরই যুগ ছিল না,

১. নৌকারোহীরা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের উচ্চ পর্যায়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী। মাঝি যখন পাল তুলে অনুকূল বাতাসে তীব্র গতিতে নৌকা চালিয়ে নিচ্ছিল, তখন আরোহীদের মন স্ফূর্তিতে নেচে উঠল। বৃদ্ধ মাঝিকে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ মাঝি ভাই, লেখাপড়া কিছু শিখেছ? বলল ঃ তার আর সুযোগ পেলাম কোথায়? তাহলে অন্তত পদার্থ বিজ্ঞান তো নিশ্চয়ই পড়েছ? বলল ঃ আমি তো তার নাম পর্যন্ত শুনিনি। আবার জিজ্ঞাসা করা হল, জ্যামিতি তো কিছু পড়েছই? কিংবা ভূগোল বা ইতিহাস? সব জিজ্ঞাসার জবাবে মাঝি যখন বলল, সে এ সবের নামও শুনেনি জীবনে, বিদ্যার্জন তো দূরের কথা, তখন সব কজন ছাত্র অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল। একসঙ্গে সকলেই বলে উঠল ঃ তাহলে তোমার জীবনটাই তো বৃথা। এমনি সময় প্রচণ্ড ঝড় উঠল, বাতাসে পাল ছিড়ে গেল। মাঝি জিজ্ঞাসা করল ঃ বাবুরা, সাঁতার জানেন তো? ছাত্ররা বলল; না। এবার মাঝি বলল ঃ তাহলে আপনাদের সকলের গোটা জীবনটাই তো বৃথা।

নারীর অপমাণ নির্যাতন ও সদ্যজাত শিশু হত্যারই যুগ ছিল না, এক কথায় তা ছিল মনুষ্যত্ব ও মানবতার চরমতম অবমাননা ও দুর্দিনের যুগ; গোটা মানবতাকে চিরতরে সমাধিস্থ করার এক কঠিন কলংকময় যুগ। মনুষ্যত্ব চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল সে অন্ধকার যুগে। এ দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا –

আর তোমরা পৌঁছে গিয়েছিলে অগ্নি-গহ্বরের মুখে। আল্লাহ্ই তা থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। (আলে-ইমরান ঃ ১০৩)

এরূপ পরিস্থিতিতে বিশ্বনবীর আগমন সমাজে যে অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, তা স্বয়ং তাঁরই একটি কথায় স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন ঃ

আর দৃষ্টান্ত, যেমন একজন লোক আগুন জ্বালাল, তখন চতুর্দিক আলোকোদ্ভাসিত হয়ে উঠল আর তখন পঙ্গপাল ও অন্যান্য পোকা-মাকড় তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করল। আর সেই ব্যক্তি সেগুলোকে তা থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার এই বাধা লংঘন করে সেগুলো সেই আগুনেই ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকল। তোমরা ধরে নিতে পার, আমিই সেই ব্যক্তি, যে সেই আগুনে ঝাপ দেয়া লোকগুলোকে বাঁধা দিচ্ছে। কিন্তু তোমরা তো মানছ না। তোমরা সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়েই চলছ। আর আমি তোমাদেরকে বলছি, আগুন থেকে সাবধান! আগুন থেকে সাবধান! (বুখারী ও মুসলিম)

প্রকৃত অবস্থাও ছিল তা-ই। সেই সময় ও তার পরবর্তীকালের সমস্ত মানুষের জীবন-তরীকে পূর্ণ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা সহকারে মুক্তি ও নিষ্কৃতির বেলাভূমে পৌঁছিয়ে দেয়াই ছিল বিশ্বনবীর প্রধান কাজ।

সমস্ত মানুষকে মনুষ্যত্বের সুস্থ প্রকৃতিতে সুসংগঠিত ও উচ্চতর মানের সমান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করাই ছিল বিশ্বনবীর সাধনা। কেননা তার ফলেই মনুষ্য রূপ প্রাসাদের বিনির্মাণ ও তাকে প্রবৃদ্ধিসম্পন্ন বানিয়ে দেয়া সম্ভব। বস্তুত মানবতাই হচ্ছে নবী-রাসূলগণের কর্মক্ষেত্র। তাঁরাই মানুষের ওপর ঝুলে থাকা কঠিন বিপদের নাঙ্গা শানিত তরবারির তলা থেকে তাকে রক্ষা করেছেন, যা কোন পরিকল্পিত জ্ঞান-বিজ্ঞান করতে পারেনি—পারেনি কোন বৈজ্ঞানিক সমাজ পরিকল্পনা। মানবেতিহাসে যখনই এমন অবস্থার উদ্ভব হয়েছে যে, মানুষ দুনিয়ায় বেঁচে থাকার অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়ে গেছে, ঠিক তখনই নবী-রাসূলগণ তাদেরকে সে অধিকার দিয়ে ধন্য করেছেন। তখন মানুষ শুধু বেঁচেই থাকেনি, বেঁচে থেকেছে পূর্ণ মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে। মানুষ যখন সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছে তাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, তখনই নবী-রাসূলগণ তাদের প্রকৃত লক্ষ্য চোখের সম্মুখে সমুদ্ভাসিত করে তুলেছেন এবং পূর্ণ মাত্রায় পরিচালিত করেছেন সেই লক্ষ্যের দিকে।

জাহিলিয়াতের যুগে মানুষের জীবনই শুধু নিঃশেষিত হয়নি, তাদের দেহ পচে-গলে অসহনীয় দুর্গন্ধে চতুর্দিক পংকিল করে তুলেছিল। ঠিক এইরূপ কঠিন সময়ই সংঘটিত

হয়েছিল বিশ্বনবীর মহান আগমন। আর তখনই আকাশমণ্ডল থেকে ঘোষিত হল : 'আমরা তোমাকে বিশ্বজাহানের জন্য একমাত্র রহমত হিসাবেই প্রেরণ করেছি'।

বিশ্বনবী সৃষ্ট নতুন জগত

আমাদের এই যুগ এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগসমূহ মূলত বিশ্বনবীরই যুগ বলতে হবে। তাঁর শাশ্বত দাওয়াতেরই যুগ এটা। কেননা মানবতা বিধ্বংসী ঝুলন্ত তরবারীটি তিনি প্রথমেই তুলে ফেলেছেন। তারপর মহামূল্য অবদানে তিনি বিশ্বমানবতাকে ধন্য করেছেন। মানবতাকে তিনি মুক্তির অভিনব পথ ও পন্থা দেখিয়েছেন, জীবন যাপন ও তৎপরতা পরিচালনের নতুন দিশার উদ্বোধন করেছেন। নতুন আশার নতুন স্বপ্ন এবং সম্পূর্ণ নতুন ভাবনা, চিন্তা ও আকীদা-বিশ্বাস দিয়ে মুমূর্ষু মানবতাকে তিনি নতুন জীবনীশক্তি দিয়ে সঞ্জীবিত করেছেন। পৃথিবীব্যাপী সূচিত হয়েছে এক নতুন সভ্যতার অন্তহীন সম্ভাবনা।

বিশ্বনবীর অবদানকে সাতটি পর্যায়ে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করা হলে যে মহামূল্য আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায়, প্রকৃতপক্ষে তা-ই হচ্ছে বিশ্বমানবতার প্রকৃত মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন।

১. পরিচ্ছন্ন ও পরিশীলিত তওহীদী আকীদা

বিশ্বমানবতার প্রতি বিশ্বনবীর অবদানসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ্য হচ্ছে : পরিচ্ছন্ন ও পরিশীলিত তওহীদী আকীদা। বস্তুত এই আকীদা ও বিশ্বাসটি সমগ্র মানব জীবনের ওপর বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তারকারী। তা ব্যক্তিকে যেমন এক স্বতন্ত্র জীবনীশক্তিতে সমৃদ্ধ করে, তেমনি গোটা সমাজ সমষ্টিকে, সমাজের সকল দিক ও বিভাগকে বিপ্লবী ভাবধারায় উজ্জীবিত করে তোলে। এই আকীদার ফলেই ব্যক্তি সর্বপ্রকার বাতিল আকীদা-বিশ্বাস, দেব-দেবী-অতিমানব পূজা ও তার কুৎসিক প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি লাভ করে। আর সমাজ-সমষ্টি নিষ্কৃতি পায় সকল প্রকারের বাতিল মতাদর্শ ও নির্যাতনমূলক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তা-বিশ্বাস ও ব্যবস্থা থেকে, যা থেকে মানুষ অপর কোন উপায়েই মুক্তি বা নিষ্কৃতি পেতে পারে না।

জাহিলিয়াতের যুগে এই তওহীদী আকীদাই ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, অবলুপ্ত, অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অনাস্বাদিত। তৎকালীন বিশ্বের মানুষ ছিল পুরামাত্রায় শিরকী আকীদার কর্দমে নিমজ্জিত। কিন্তু যে মুহূর্তে বিশ্বনবীর কণ্ঠে এই বিপ্লবাত্মক তওহীদী আকীদার ধ্বনি উচ্চারিত হল, শিরক ও মনগড়া আকীদা-বিশ্বাসের অন্ধ গহ্বরে নিমজ্জিত বিশ্বমানবতা হতচকিত হয়ে উঠল। থরথর করে কেঁপে উঠল—চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল এর ভিত্তিতে গড়া নড়বড়ে প্রাসাদ-দুর্গসমূহ। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল মানুষের দাসত্ব-শৃঙ্খল—মানুষকে শোষণ-পীড়ন করার সমস্ত ষড়যন্ত্রজাল। মানবতা পেল সত্যিকারের মুক্তি—পেয়ে গেল সেরা সৃষ্টি হওয়ার মহান মর্যাদা ও অধিকার। মানুষ সকল প্রকারের হীনতা-নীচতা ও অনৈতিকতার পংকিলতা থেকে সম্পূর্ণরূপ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠল।

২. মানবতার একত্ব ও সাম্য

বিশ্বনবীর দ্বিতীয় ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে—বিশ্বমানবতার ঐক্য, অভিন্নতা এবং পূর্ণ মাত্রার সাম্য। মানুষ সাধারণত বিভিন্ন আকার-আকৃতির হয়ে থাকে। তাদের গায়ের বর্ণও অভিন্ন নয়। এমনকি, তাদের নিকট-অতীতের বংশীয় ধারাবাহিকতাও অক্ষুণ্ন থাকে নি। কিন্তু মৌলিকতার দিক দিয়ে মানুষ যে একই বংশোদ্ভূত, একই পিতা ও মাতার সন্তান, তা প্রথমবারের মত হযরত মুহাম্মাদ (স) এর কণ্ঠেই ধ্বনিত ও প্রচারিত হল। অথচ তখনকার দুনিয়ার মানুষ সংকীর্ণ গোত্র, শ্রেণী, বর্ণ ও বংশে অত্যন্ত করুণভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এ সবের মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছিল, তা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। মানুষের মধ্যে অভিন্নতা ও ঐক্য বা একত্ব পর্যায়ে কোন ধারণা পর্যন্ত ছিল না তখনকার দুনিয়ার কোন একটি সমাজেও; বরং মানুষ ছিল মানুষের দাসানুদাস, মানুষের প্রভু—সার্বভৌম। মানুষের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ঠিক সেই পার্থক্য ছিল, যা ছিল মানুষ ও পশুর মধ্যে। ঠিক এরূপ পরিস্থিতিতে বিশ্বনবী (স) উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ

ايّها النّاس انّ ربّكم واحد وانّ اباكم واحد كلّكم بنو ادم وادم من تراب ان اكرمكم عند الله اتقاكم ليس اعربى على عجمى فضل الابالتّقوى -

হে মানুষ! তোমাদের রব্ব—মা'বুদ, প্রভু, সার্বভৌম মাত্র একজন (অর্থাৎ আল্লাহ্) এবং তোমাদের সকলের পিতাও মাত্র একজন—তোমরা সকলেই আদমের বংশধর আর আদম মাটি থেকে সৃষ্টি। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট অধিক সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়াসম্পন্ন। আর কোন আরবেরই বিশেষ কোন মর্যাদা নেই কোন অনারবের ওপর; তবে তাকওয়ার ভিত্তিতে পার্থক্য হবে।[১]

এই ঘোষণাটিতে দুটি ঘোষণার সমন্বয় ঘটেছে। সেই দুটি ঘোষণার ওপরই বিশ্বশান্তি নির্ভর করে। প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক সমাজে কেবলমাত্র এ দুটি ঘোষণার ভিত্তিতেই প্রকৃত শান্তি ও স্বস্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর। তা হচ্ছে রব্ব-এর এক ও অভিন্ন হওয়া এবং বিশ্বমানবতার একত্ব ও অভিন্নতা।

রব্ব-এর এক ও অভিন্ন হওয়ার অর্থ ঃ মানুষের উপাস্য-আরাধ্য, স্রষ্টা-রিযিকদাতা ও আইন-বিধানদাতা তথা সার্বভৌম একমাত্র আল্লাহ্। তিনি ছাড়া এই সব গুণের অধিকারী আর কেহ নেই—আর কেউ নয়। উপাস্য-আরাধ্য একজন আর আইনদাতা অন্য একজন এই ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অগ্রহণযোগ্য।

মানুষের রব্ব, মা'বুদ বা উপাস্য ও সার্বভৌম একমাত্র আল্লাহ্। এটাই হচ্ছে বিশ্ব-দর্শন ও সমাজ-দর্শনের মৌল ভিত্তি। আর দ্বিতীয় এই যে, সকল মানুষ একই বংশজাত। সকলেরই দেহে একই পিতা ও মাতার রক্ত প্রবহমান।

১. كنزل العمل

يَـٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً –

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই রব্বকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একটিমাত্র জীবসত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকেই তার জুড়ি সৃষ্টি করেছেন। আর এই উভয়ের বংশধর হিসেবে বহু সংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রীকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। (সূরা আন্-নিসা ঃ ১)

বস্তুত এ দুটি ঘোষণা যেমন ছিল সম্পূর্ণ অভিনব, তেমনি তদানীন্তন সমাজ পরিবেশে ছিল অত্যন্ত বিপ্লবাত্মক। সেকালের সমাজ প্রাসাদের পক্ষে তা ছিল এক প্রলয় সৃষ্টিকারী কম্পন। তখনকার দুনিয়া এরূপ একটি বিপ্লবাত্মক ঘোষণার সাথে কিছুমাত্র পরিচিত ছিল না। এই ঘোষণার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল শিরক, মূর্তিপূজা, মানুষের গোলামী, রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, পৌরহিত্যবাদ ও নৈরাজ্যবাদের সর্বব্যাপী দুশ্ছেদ্য জাল। যদিও আজকের দিনের বহু আন্তর্জাতিক সংস্থাই এ ধরনের কথা বলছে, মানবাধিকার সনদ (Human Rights Charter)-ও রচিত এবং ঘোষিত হয়েছে, মানুষের সাম্যের ধ্বনি তোলা হয়েছে; কিন্তু সেদিনের মানুষ এসবের কিছুই জানত না। তখনকার মানুষ বংশীয় অভিজাত্য ও গোত্রীয় হীনতার তারতম্যে মর্মান্তিকভাবে বিভক্ত ছিল। কোন কোন বংশ নিজেদেরকে সূর্য বা চন্দ্রের অধঃস্তন বলে দাবি করত। ইয়াহুদী-খৃস্টানরা নিজেদের সম্পর্কে বলত ঃ

نحن ابناء الله واحباءه –

আমরাই হচ্ছি আল্লাহ্‌র সন্তান ও সর্বাধিক প্রিয় লোক।

আর কয়েক হাজার বছর পূর্বে মিসরের ফিরাউনের দাবি ছিল ঃ আমরা Ray সূর্যের অর্থাৎ খোদার প্রতিবিম্ব। তার প্রভাবও চতুর্দিকে বিদ্যমান। উপমহাদেশে তখন সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশের (অর্থাৎ সূর্যের সন্তান ও চন্দ্রের বংশধরদের) রাজত্ব চলছিল। পারস্যের কিসরারা মনে করত ঃ তাদের দেহে খোদায়ী রক্ত প্রবহমান। জনগণ তাদের প্রতি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাবোধ সহকারে তাকাত। রোমের কাইজারও মানুষের খোদা হয়ে বসেছিল। লোকদের ধারণা ছিল, যারাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়, তারাই 'খোদা'। তাদের উপাধি দেয়া হয়েছিল August (মহিমান্বিত, মহাসম্মানিত, অতিশয় শ্রদ্ধাস্পদ)।[১] ওদিকে চীনের লোকেরা সম্রাটকে 'আকাশ-পুত্র' মনে করত। তাদের বিশ্বাস ছিল আকাশ পুরুষ, পৃথিবী স্ত্রী আর এ দুয়ের সম্মিলনে এই বিশ্বলোকের অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে।

বস্তুত এই সব ধারণা যে নিতান্তই কুসংস্কার, হীনতা ও অজ্ঞতাপ্রসূত তা সেদিনের লোকেরা উপলব্ধি করতে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিল। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর

১. আর আধুনিক ভাষা His Highness . His Holiness. His Excellency প্রভৃতি।

আগমনের ফলেই এ ধরনের অসংখ্য ভিত্তিহীন ধারণার হীনতা থেকে মুক্তিলাভ করা সম্ভব হয়েছে বিশ্বমানবতার পক্ষে।

৩. মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব

বিশ্বমানবতার প্রতি বিশ্বনবীর তৃতীয় বড় অবদান হচ্ছে সৃষ্টিলোকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চতর মর্যাদার ঘোষণা। বিশ্বনবীর আগমনের পূর্বে মানুষ ছিল লাঞ্ছিত, অবমানিত। প্রকৃত মানুষের কোন মর্যাদাই স্বীকৃত ছিল না এবং ভূপৃষ্ঠে মানুষের চাইতে হীন ও নীচ জিনিসও আর কিছুই ছিল না। মানুষের তুলনায় কোন কোন বিশেষ জন্তু ও বিশেষ বৃক্ষের মর্যাদা ছিল অনেক বেশী। সেই বিশেষ জন্তু বা বৃক্ষের মর্যাদা ও সন্তুষ্টি বিধানের জন্য মানুষকে অকাতরে বলিদান করা হত। বিশ্বনবী (স)-ই দুনিয়ার সামনে সর্বপ্রথম ঘোষণা করলেন, মানুষ এই সমগ্র সৃষ্টিলোকে একমাত্র সেরা সৃষ্টি—আশরাফুল মাখলুকাত। মানুষ সৃষ্টিলোকের কোন কিছুর তুলনায়ই হীন নয়; বরং সকলেই ঊর্ধ্বে আর তার ঊর্ধ্বে শুধুমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। তিনি ছাড়া মানুষের তুলনায় অধিক মর্যাদার অধিকারী আর কিছু নেই, আর কেউ নয়। এই পৃথিবীতে মানুষ একমাত্র আল্লাহ্র বান্দা এবং সেই সাথে সে আল্লাহ্র খলীফা; আল্লাহ্র বান্দা হয়ে তাঁর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করাই এখানে মানুষের কর্তব্য আর তাতেই নিহিত মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্বোচ্চ মর্যাদা। বিশ্বলোকের সবকিছুই মানুষের খেদমতে, মানুষের কল্যাণে চির নিয়োজিত। মানুষের এই তুলনাহীন মর্যাদার ঘোষণা কেবলমাত্র বিশ্বনবীর কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছে সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ বারের তরে। তাঁর পূর্বে যেমন এরূপ ঘোষণা কেউ দেয়নি—দিতে পারেনি, বর্তমান সময় পর্যন্ত তথা কিয়ামত পর্যন্তও এরূপ উদাত্ত ঘোষণা আর কেউ দিতে পারবে না।

বিশ্বনবীর আগমনের পূর্বে এক ব্যক্তির কামনা-বাসনার পাদমূলে শত-সহস্র মানুষের জীবনকে উৎসর্গ করাও কিছুমাত্র অন্যায় বা নিন্দনীয় ছিল না। ফলে এক এক ব্যক্তি শক্তি বলে এক-একটি দেশ দখল করে নিত আর দাসানুদাস বানিয়ে নিত লক্ষ কোটি মানুষকে। তাদের জিঘাংসা চরিতার্থ করার জন্য ধ্বংস করা হত শহর-নগর-জনপদ ও শস্য-শ্যামল ক্ষেত-খামার। হিংস্র ক্ষুধার্ত শার্দুল যেমন সহসা জঙ্গল থেকে হুংকার দিয়ে বেরিয়ে এসে অসহায় নিরস্ত্র মানুষের ভিড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সকলকে ছিন্নভিন্ন করে তাদের তপ্ত রক্ত পান করে জিঘাংসা চরিতার্থ করে, মানব সমাজের সাধারণ অবস্থা তা থেকে ভিন্নতর কিছু ছিল না। দূর অতীতে যেমন তার নিদর্শন মেলে, আজকের দুনিয়ায়ও তার দৃষ্টান্ত কিছুমাত্র বিরল নয়। এই সব কিছুর মূলেই রয়েছে ব্যক্তির লোভ-লালসা, সার্বভৌমত্বের খাহেশ এবং মানুষকে নিজের দাসানুদাস বানাবার প্রচণ্ড উন্মাদনা।

কিন্তু বিশ্বনবী উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, মানুষ মানুষের দাস হতে পারে না। মানুষের প্রভু—সার্বভৌম হতে পারে না কোন মানুষ, বরং মানুষ হিসেবে সকলেই সমান, সর্বতোভাবেই অভিন্ন। মানুষ অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় লক্ষ্যহীন-উদ্দেশ্যহীন হতে পারে না। আর কোন বৈষয়িক স্বার্থ বা সুযোগ-সুবিধা লাভ কিংবা জৈবিক কামনা-

বাসনা চরিতার্থ করাই মানুষের জীবন-লক্ষ্য হতে পারে না। বিশ্বনবীর আগমনের পূর্বে দুনিয়ার মানুষের কোন জীবন-লক্ষ্য নির্দিষ্ট বা সুস্পষ্ট ছিল না—ছিল না মহত্তর ও উচ্চতর কোন লক্ষ্যে কাজ করার একবিন্দু প্রেরণা। তাই বিশ্বনবী (স) ঘোষণা করলেন, মানুষ এই দুনিয়ায় কেবল মাত্র বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই কাজ করবে। অন্য কারোর অভিলাষ পরিপূরণের জন্য মানুষ কিছু করতে বাধ্য নয়।

৪. নৈরাশ্য-হতাশার প্রতিরোধ

তদানীন্তন মানুষ ছিল হতাশাগ্রস্ত, নৈরাশ্যে জর্জরিত। আল্লাহ্র রহমত পাওয়ার কোন আশাবাদ মানুষ পোষণ করত না। মানব-প্রকৃতির প্রতি ছিল তীব্র ঘৃণা ও অত্যন্ত খারাপ ধারণা। কোন কোন প্রাচীন ধর্মমতও মানুষের মনে এই হতাশা ও ঘৃণা সৃষ্টির ব্যাপারে বিরাট অবদান রেখেছিল। উপমহাদেশের মানুষের মনে জন্মান্তরবাদ প্রবলভাবে বাসা বেঁধেছিল, যা মানুষের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে চক্রাকারে চলতে থাকে; ছিল বৈরাগ্যবাদ, যা মানুষকে বানিয়েছিল দুনিয়াত্যাগী—ঘর-সংসার-বিবাগী।

পক্ষান্তরে খৃস্টধর্ম প্রচার করছিল, মানুষ জন্মগতভাবেই মহাপাপী। ঈসা মসীহ্ই শূলবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে পাপী মানুষের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করে গেছেন। ফলে খৃস্ট ধর্মাবলম্বী কোটি কোটি মানুষ নিজেদের সম্পর্কে অত্যন্ত হীন ধারণা পোষণ করতে থাকে। নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে কোন আশাবাদই খুঁজে পায় না এবং নিজেদেরকে আল্লাহ্র রহমত থেকে চিরবঞ্চিত ধারণা করতে থাকে।

এই প্রেক্ষিতে বিশ্বনবী (স) উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন ঃ মানুষের প্রকৃতি নির্মল ও পরিচ্ছন্ন দর্পণের ন্যায়। এখন পর্যন্ত তার ওপর কিছুই লিখিত হয়নি। এখন মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন; নিজের ভালো বা মন্দ যা-ই ইচ্ছা, তা-ই সে লিখে নিতে পারে। সে নিজের সম্পর্কে যা-ই লিখবে, তা-ই হবে তার নিয়তি। সে অন্য কারো কোন কাজের জন্য দায়ী নয়। সে নিজে ভালো বা মন্দ যা-ই করবে, তারই প্রতিফল সে লাভ করবে অনিবার্যভাবে।

এই ঘোষণার ফলে মানুষের মনে ভবিষ্যত সম্পর্কে আশাবাদের আলো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠে। নিজের ভাগ্য সে নিজেই রচনা করতে উদ্যোগী ও তৎপর হয়। মানুষ বুঝতে পারে, ভুল ও মূর্খতার মধ্যে লিপ্ত হওয়ার কারণেই সে গুনাহ করে। গুনাহ তার ভাগ্যলিপি নয়। সে ইচ্ছা করলেই এই ভুল ও গুনাহকে অতিক্রম করতে ও এড়িয়ে যেতে পারে। অতীত গুনাহের ক্ষমা লাভের চিররুদ্ধ দুয়ার তার সম্মুখে উন্মুক্ত হয়ে যায়। কুরআনের উদাত্ত ঘোষণা রাসূলের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় ঃ

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا –

বল হে মানুষ! যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে কিছু মাত্র নিরাশ হবে না। আল্লাহ্ সব গুনাহই মাফ করে দেবেন।

৫. দ্বীন ও দুনিয়ার অভিন্নতা

প্রাচীন কালের প্রায় সব ক'টি ধর্মমতই মানুষের জীবনকে দুটি পরস্পর বিরোধী খাতে বিভক্ত করে দিয়েছে। একটি তার ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক জীবন আর অপরটি তার বৈষয়িক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন। এর একটির সাথে অপরটির কোন দূরতম সম্পর্কও আছে বলে মেনে নেয়া হয়নি।

এরই ফলে দুনিয়ার মানুষ যে ধর্ম পালন করত, তার কোন প্রভাব তার বৈষয়িক জীবন—পরিবার, রাজনীতি ও অর্থনীতির ওপর স্বীকার করত না। এসব ক্ষেত্রে তারা নিতান্তই ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত নীতিতে কার্যাবলী পরিচালনা করত। সে ক্ষেত্রে তারা হত সম্পূর্ণরূপে ধর্মহীন। মানব সমাজেও এই বিভক্তি এমন পরিস্থিতির উদ্ভব করে, যার দরুণ এক শ্রেণীর মানুষ হয় শুধু 'ধার্মিক' আর অপর শ্রেণীর মানুষ হয়ে উঠে শুধু রাজনীতিক ও রাষ্ট্রনায়ক। ধার্মিক লোকেরা শুধু ধর্ম-কর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকত। রাজনীতি তথা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাদের কোন ঔৎসুক্য বা অংশীদারিত্ব ছিল না। ফলে ধর্ম নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত হয়। আর রাজনীতি ও রাষ্ট্র হয় ব্যক্তি বা শ্রেণীর স্বেচ্ছাচারিতার লীলাক্ষেত্র। অবশ্য উভয় ক্ষেত্রের প্রধানরা পরস্পরকে সমর্থন ও সহযোগিতা দিতে কুণ্ঠিত হত না।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-ই সর্বপ্রথম উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ ধর্ম, জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন ও ভিন্নতর কোন জিনিস নয়। আর জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতি নয় ধর্মের সাথে সম্পর্কহীন কোন ব্যাপার। মূলত যে ধর্মের সাথে মানুষের বাস্তব জীবনের কোন সম্পর্ক নেই, সে ধর্ম ধর্মই নয়, তা অর্থহীন অন্তঃসারশূন্য অনুষ্ঠানাবলী মাত্র। তিনি ঘোষণা করলেন ঃ মানুষ যেমন ব্যক্তি জীবনে কেবলমাত্র এক আল্লাহ্‌র বন্দেগী করবে, তেমনি সে তার সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রেও সেই এক আল্লাহ্‌রই নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে চলবে। কেননা মানুষের গোটা জীবন এক অবিভাজ্য একক বিশেষ। তাকে কোনক্রমেই বিভিন্ন খাতে বিভক্ত করা চলে না; বিভক্ত করতে চাওয়া চরম অজ্ঞতা ও মূর্খতা বৈ কিছু নয়। যারা রাজনীতি ও সমাজকে ধর্ম বিমুক্ত রাখতে চায়, তারা আসলে অনাচার ও স্বৈরতন্ত্রেরই সমর্থক। মানুষকে তার সমগ্র জীবনে শুধু আল্লাহ্‌র দেয়া একটি মাত্র বিধানই পালন করতে হবে। সে বিধান হচ্ছে আল-ইসলাম। আর আল-ইসলাম মানুষের জন্য এক পূর্ণাঙ্গ দ্বীন—জীবন বিধান। এখানে ধর্ম ও রাজনীতি একই পূর্ণাঙ্গ আদর্শের ভিত্তিতে চলে, অন্যথায় মানুষের জীবন শোষণ-নির্যাতন-বঞ্চনা ও মানুষের নিকৃষ্ট দাসত্বের নিষ্পেষণে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও জর্জরিত হবে। দুনিয়ার সাধারণ ধর্মগুলোই মানুষের জীবনকে প্রধান দুটি খাতে বিভক্ত করেছে। কেননা সেসবের নিকট মানুষের সমগ্র জীবনকে অবিভক্তভাবে একই বিধানের ভিত্তিতে গড়ে তোলার ও পরিচালিত করার মত কোন বিধানই নেই। এ কারণে সেসব ধর্ম সময়-কাল অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। কেননা যেসব ধর্ম মানুষের জীবনের চাহিদা একই বিধানের ভিত্তিতে পূরণ করতে পারে না, সেসব ধর্ম মানুষের পক্ষে পালন করাও সম্ভব নয়। আর একমাত্র ইসলামই যখন মানব জীবনের সকল প্রকারের প্রয়োজন

পূর্ণ দক্ষতা সহকারে পূরণ করতে সক্ষম, তখন ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন ধর্মই মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

বস্তুত বিশ্বনবী বিশ্বমানবের জন্য এক বিশ্ব দ্বীন উপস্থাপন করেছেন। বিশ্বলোককে যেমন বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন মনে করা যায় না, তেমনি বিশ্বমানবের জন্য এক সর্বাত্মক দ্বীনই প্রয়োজন। সে দ্বীনের চরমতম লক্ষ্য একমাত্র আল্লাহ্র আনুগত্য ও তাঁর (আল্লাহ্র) সন্তুষ্টি অর্জন। কুরআন প্রত্যেকটি মানুষের জন্য এই ঘোষণা বিধিবদ্ধ করে দিয়েছে ঃ

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ – لَا شَرِيْكَ لَهٗ ج وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ –

বল, নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার যাবতীয় ইবাদত, কুরবানী—আমার গোটা জীবন ও মৃত্যু একমাত্র রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্রই জন্য উৎসর্গিত। তাঁর কেউ শরীক নেই। এরূপ তওহীদী আকীদা গ্রহণের জন্যই আমাকে আদেশ করা হয়েছে। অতএব, আমিই এই আকীদার নিকট সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী।

(আল-আন'আম ঃ ১৬২ ও ১৬৩)

৬. নেতৃত্বে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন

বিশ্বনবী বিশ্বমানবের জন্য বিশ্ব আদর্শ হিসেবে দ্বীন-ইসলাম পেশ করেই ক্ষান্ত হন নি, সেই সাথে সে আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য একান্ত অপরিহার্য শর্ত হিসেবে পেশ করেছেন আদর্শবাদী নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা। তাঁর দ্বীনের তওহীদী দাওয়াতের মূল আওয়াজই ছিল ঃ একমাত্র আল্লাহ্র দাসত্ব কবুল কর, আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের আর কেউ ইলাহ্ নেই। একমাত্র আল্লাহ্র দাসত্ব অবলম্বন কর এবং আল্লাহ্দ্রোহী শক্তিকে উৎখাত কর।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আনুগত্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আনুগত্য ছাড়া কোন সমাজ বা রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে না, একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য, মানুষ যারই আনুগত্য করবে, বাস্তবভাবে তারই দাস হয়ে থাকবে। তাই রাসূলে করীম (স)-এর দাওয়াত যেমন ছিল একমাত্র আল্লাহ্র দাসত্ব কবুল করার, তেমনি এবং সেই সাথেই দাওয়াত ছিল মৌলিকভাবে একমাত্র আল্লাহ্রই আনুগত্য করার। আর রাসূলের আনুগত্য করতে হবে আল্লাহ্র আনুগত্যের অনুসঙ্গ হিসেবে। কেননা রাসূলের আনুগত্য না করে আল্লাহ্র আনুগত্য করা যায় না। এছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করা যেতে পারে কেবল তখন, যদি সে আনুগত্য কার্যত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে পরিণত হয়। যে আনুগত্য আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্যে পরিণত হয় না, সে আনুগত্য কোনক্রমেই করা যেতে পারে না। কেননা তা কার্যত আল্লাহ্দ্রোহিতারই শামিল।

তাই রাসূলে করীম (স) আল্লাহ্র নির্দেশ পেয়ে শুরুতেই যে দাওয়াত জনসমক্ষে পেশ করলেন, তা ছিল ঃ দাসত্ব কর নিরংকুশভাবে ও সম্পূর্ণরূপে একমাত্র আল্লাহ্র এবং

আল্লাহ্দ্রোহী—আল্লাহ্র নির্দিষ্ট সীমা লংঘনকারী ব্যক্তিদের নেতৃত্ব উৎখাত কর। যুদ্ধ কর তাদের বিরুদ্ধে, যতক্ষণ না আল্লাহ্দ্রোহীদের দাসত্বজনিত ফেতনার অবস্থা অবলুপ্ত হয় এবং সর্বাত্মক সার্বভৌমত্ব ও আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্রই জন্য নিশ্চিত হয়ে যায়। (আল-বাকারা ঃ ১৯৩)

দুনিয়ার মানুষের নিকট এ ছিল বিশ্বনবীর বিশ্ববিপ্লবের আহ্বান—ফাসিক, ফাজির, কাফির, মুনাফিক, শোষক, জালিম ও স্বৈরাচারী নেতৃত্বের অধীন শতাব্দীকাল ধরে নির্যাতিত-নিষ্পেষিত মানবতার জন্য সার্বিক মুক্তির পয়গাম।

৭. নতুন মানুষ—নবতর জগত সৃষ্টির আহ্বান

বিশ্বনবীর এসব বিপ্লবাত্মক পয়গাম বিশ্বমানবতাকে নতুন বিপ্লবী ভাবধারায় গড়ে উঠে নবতর জগত সৃষ্টির আহ্বান জানিয়েছিল। এর ফলেই গড়ে উঠেছিল নতুন মানুষ, এক নতুন সমাজ। সে সমাজ সর্বপ্রকার কুসংস্কার, ভিত্তিহীন ধারণা-বিশ্বাস ও যুক্তিহীন দাসত্ব-আনুগত্য থেকে মুক্তি পেয়েছিল। তাই সমাজের মানুষ এক আল্লাহ ছাড়া আর কারোর দাসত্ব-আনুগত্য করতে এবং বিশ্বনবীর একক নেতৃত্ব ছাড়া আর কারোর নেতৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য ছিল না। তিনি তদানীন্তন দুনিয়ার পারসিক ও রোমান—এই দুই পরাশক্তিরমুকাবিলায় এক নতুন শক্তির অভ্যুদয় ঘটানো—প্রতিষ্ঠিত দুটি সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের ওপর এক নতুন সভ্যতার উত্থান ঘটানোর সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। এভাবে তিনি এক অভিনব শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তার ওপর অনতিবিলম্বে বিনির্মিত হয়েছিল বিশ্বমানবতার দিগদিশারী এক নবতর জীবনের আলোকস্তম্ভ। তথায় প্রতিটি মানুষ পেয়েছিল তার শাশ্বত মর্যাদা, অধিকার ও নিরাপত্তা। আল্লাহ্র দেয়া মৌলিক বিধান ও বিশ্বনবীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও প্রয়োগের ভিত্তিতে মানুষের যাবতীয় সমস্যার যথার্থ সমাধান সম্ভবপর হয়েছিল। তা থেকে একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষের সার্বিক মুক্তি একমাত্র আল্লাহ্র দাসত্ব ও বিশ্বনবীর নেতৃত্বেই সম্ভব। অন্য কোনভাবে মানবজীবনের কোন সমস্যারই সমাধান হতে পারে না। শুধু তাই নয়, অন্য কারো আনুগত্য ও নেতৃত্বের ভিত্তিতে মানব সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করা হলে সে সমস্যা আরও অধিক জটিল ও দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। মানুষ বঞ্চিত হবে তার আসল মর্যাদা ও অধিকার থেকে; হারিয়ে ফেলবে জীবনে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তাটুকুও। বর্তমান বিশ্বমানবের বাস্তব অবস্থাই তার অকাট্য প্রমাণ।

তা সত্ত্বেও বিশ্বনবীর এ অবদান যেহেতু চিরন্তন ও শাশ্বত, তাই আজকের দিনেও তা বাস্তবায়িত হলে আজও তার সুফল পাওয়া সম্ভব। এ অবদানের বাস্তবায়নে আজও সম্ভব এক নবতর বিশ্বজয়ী সভ্যতার জন্মদান এবং আজকের ক্ষমতাগর্বীদের দাপট খর্ব করে তাদের ধ্বংসাবশেষের ওপর এক নতুন মহাশক্তির প্রতিষ্ঠা। অবশ্য সেজন্য এক সর্বাত্মক জিহাদের প্রয়োজন। সেই জিহাদ পরিচালনা করতে কেউ প্রস্তুত আছেন কি।

বিশ্বনবী প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের আদর্শ

ইসলামের পূর্বে আরব দেশে কোন সুসংগঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা কার্যকর ছিল না। গোটাআরব ছিল কতিপয় বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী বা গোত্রের সমষ্টি। এদের পরস্পরের মধ্যে কোন সমন্বয় সূত্রও ছিল না। প্রতিটি গোত্র নিজস্ব রসম-রেওয়াজের অনুসারী ছিল। আর তার ওপর চলত গোত্রপতির আদেশ-নিষেধের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য। কোন গোত্রই অপর কোন গোত্রের কর্তৃত্ব বা প্রাধান্য কিংবা অন্য কোন ব্যক্তির অধীনতা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। গোত্রপতির প্রাধান্যও খুব বেশী প্রভাবশালী হত না। মূলত তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই ছিল স্বেচ্ছাচারী। চারদিকে হত্যাকাণ্ড, মারামারি ও লুঠতরাজ চলত অবাধে। শক্তিমান ব্যক্তি নিজেকে দুর্বলদের অধিকার হরণ করা ও তাদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালানোর নিরংকুশ অধিকারী বলে মনে করত। কিন্তু দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সমগ্র আরব দেশে গোত্রীয় অনৈক্য ও পারস্পরিক ঝাগড়া-বিবাদ সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়ে যায়। শত বছর পূর্ব থেকে চলে আসা এই বিপর্যস্ত অবস্থাকে একটি সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে আনা সম্ভবপর হয়েছিল। তখন সমগ্র আরব জনতাকে একটি মহান আদর্শিক ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে দেয়া হয়েছিল। আর তা সম্ভবপর হয়েছিল কেবলমাত্র এইজন্য যে, সমগ্র আরব জনগণ ইসলাম গ্রহণ করে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে নিজেদের সর্বোচ্চ নেতা ও প্রশাসক রূপে মেনে নিয়েছিল।

বস্তুত হযরত মুহাম্মাদ (স) ছিলেন আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশেষ রাসূল ও খাতামুন্নাবিয়্যীন। দ্বীন-ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর দায়িত্ব। আর দ্বীন প্রতিষ্ঠার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজ গড়ে তোলা, যেখানে আল্লাহ্‌র দ্বীনই হবে একমাত্র বুনিয়াদী আদর্শ এবং আল্লাহ্‌র কুরআন ও রাসূলের সুন্নাত হবে আইনের একমাত্র উৎস। রাসূলে করীম (স) তাঁর জীবদ্দশাতেই সমগ্র আরবের বুকে এমনি একটি সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর জীবন সাধনার চূড়ান্ত সাফল্য এখানেই নিহিত।

নবী করীম (স)-এর জীবনকালেই আরবের প্রতিটি অঞ্চল এই রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে এসে গিয়েছিল। আরবদেশের পার্শ্ববর্তী বেশ কয়েকটি অঞ্চলও রাসূলে করীম (স)-এর আনুগত্য স্বীকার করে মদীনা রাষ্ট্রের অধীনতা মেনে নিয়েছিল।

যে সব অঞ্চল মদীনা রাষ্ট্রের আওতাধীন হয়েছিল, সেগুলোকে মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

১. যে সব অঞ্চল যুদ্ধ জয়ের ফলে মদীনা রাষ্ট্রের অধীন হয়েছিল। নবী করীম (স) এই সব অঞ্চলে নিজের পক্ষ থেকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর

সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন হযরত ইতাব ইবনে উসাইদ (রা)-কে। হিজাজ ও নজদ এই এলাকার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২. যে সব এলাকা সন্ধির ফলে মদীনা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল সে সব এলাকায় ইসলামের পূর্বে বিভিন্ন ধরনের রাজতন্ত্র ও স্থানীয় কর্তৃত্ব-সম্পন্ন প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। নবী করীম (স) এসব রাজা ও আমীরকে পদচ্যুত করার পরিবর্তে তাদেরকে স্ব স্ব পদে বহাল রেখেছিলেন। কেননা দেশ দখল করাই নবী করীম (স)-এর নীতি ছিল না। স্থানীয় প্রশাসকের হাত থেকে কর্তৃত্ব কেড়ে নিয়ে স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করাও ছিল না তাঁর প্রধান লক্ষ্য; বরং মানবতাকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে একমাত্র মহান আল্লাহ্র বান্দা বানানোর উদ্দেশ্যেই তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। সুতরাং সাম্রাজ্য বিস্তার করাই তাঁর কোন লক্ষ্য ছিল না। এ কারণে যে সব দেশের রাজা-বাদশাহ ও স্থানীয় শাসনকর্তা দ্বীন-ইসলাম কবুল করেছিলেন, তাদের হাতেই তিনি তাদের কর্তৃত্ব—এলাকার প্রশাসন ভার অর্পণ করেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, যে সব স্থানীয় প্রশাসক দ্বীন-ইসলাম গ্রহণ না করেও ইসলামী রাষ্ট্রকে জিযিয়া দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন, সেই সব এলাকার কর্তৃত্বও তিনি তাদের হাতেই থাকতে দিয়েছিলেন। এদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ ব্যতীত অন্য কিছুর দাবি কখনই করা হয়নি।

এই অঞ্চলগুলো নিম্নলিখিত প্রদেশ ও স্থানীয় কর্তৃত্বে বিভক্ত ছিল ঃ

১. বাহরাইন রাষ্ট্র—এখানকার প্রশাসক ছিলেন মুসলমান। আর তাঁর নাম ছিল মুন্যির ইবনে সাভী।

২. আম্মান রাষ্ট্র—দুই ভাই এখানকার প্রশাসন পরিচালক ছিলেন। একজনের নাম ছিল জায়ফর আর অপরজনের নাম ছিল আরফ। এরা দু'জনই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

৩. তাইমা—স্থানীয় রাষ্ট্র। এর শাসনকর্তা ছিল একজন ইয়াহুদী।

৪. আয়লা—স্থানীয় রাষ্ট্র। এখানকার প্রশাসক ছিল একজন খৃস্টান।

৫. দওমাতুল জান্দাল—স্থানীয় রাষ্ট্র। এখানকার প্রশাসনেও একজন খৃস্টান নিযুক্ত ছিল।

৬. নাজরান—স্থানীয় প্রশাসন। এটাও খৃস্ট ধর্মাবলম্বী ছিল।

৭. ইয়ামেন—এই প্রদেশটি বিভিন্ন স্থানীয় প্রশাসনে বিভক্ত ছিল। এ সবের অধিকাংশ প্রশাসক ছিলেন হিম্য়ারী। তাঁরা রাসূলে করীম (স)-এর উপস্থাপিত দ্বীন কবুলের আহ্বানে মুসলমান হয়েছিলেন। সানার শাসনকর্তা বাযান ইবনে সাসান পারসিক ছিলেন। তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

রাসূল প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের আদর্শিক ব্যবস্থা

রাসূলে করীম (স)-এর সময়কালে নিম্নলিখিত ধর্মসমূহ প্রচলিত ছিল ঃ

১. দ্বীন-ইসলাম। তা ছিল এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় আদর্শ। দেশের অধিকাংশ অধিবাসীই

ছিলেন মুসলমান। আর সংখ্যাগুরু অধিবাসীদের জীবন আদর্শই যে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হওয়ার স্বাভাবিক অধিকারী, তাতে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না।[১] কেননা প্রশাসনের নিয়ম-শৃঙ্খলা পরিচালনের দায়িত্ব প্রধানত তাদের ওপরই অর্পিত হয়ে থাকে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সংকট বা তার ওপর হুমকি দেখা দিলে সংখ্যাগুরু জনতাই তখন নিজেদের ধনমাল ও জান-প্রাণ কুরবান করার জন্য প্রস্তুত হয়। কেননা দেশের স্বাধীনতাই তাদের স্বাধীনতা। তাদের নিজেদের স্বাধীনতা দেশের স্বাধীনতার ওপরই নির্ভরশীল। এমতাবস্থায় সংখ্যাগুরু জনতার স্বকীয় জীবনাদর্শের পূর্ণ বাস্তবায়নই যেমন একমাত্র ন্যায়সঙ্গত শাসন ব্যবস্থা হতে পারে, তেমনি সংকটকালে তাদের নিকট থেকে জান-মালের কুরবানী লাভ করতে হলে তাদেরই জীবনাদর্শকে পূর্ণ বিজয়ী ও সর্বাত্মকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা একান্তই অপরিহার্য। অন্যথায় দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব কিছুতেই রক্ষা পেতে পারে না।

২. ইয়াহুদী ধর্মমত। দক্ষিণে ইয়ামেন ও উত্তরে সিরিয়ায় এই ধর্মাবলম্বী জনতা বাস করত।

৩. খৃস্ট ধর্মমত। এই ধর্মে বিশ্বাসী লোকদেরও অধিকাংশই বাস করত ইয়ামেন ও সিরিয়ায়।

৪. অগ্নিপূজার ধর্ম। এই ধর্মের লোক প্রধানত বাহ্‌রাইনে বাস করত। এই শেষোক্ত তিনটি ধর্মাবলম্বী লোকদের প্রতি ইসলামী রাষ্ট্রে পূর্ণ সুবিচার ও ন্যায়পরতার আচরণ প্রদর্শন করা হত। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণ যেসব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন, তাদের জন্যও ছিল সেই সব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা। অনুরূপভাবে তাদের ওপর দায়-দায়িত্বও ঠিক সেই রূপই অর্পিত ছিল, যা ছিল সংখ্যাগুরু মুসলিম জনতার ওপর। বস্তুত অধিবাসী জনগণের মধ্যে এমন এক মহত্তর সাম্য ও নিরপেক্ষ ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর ছিল, যার কোন দৃষ্টান্ত কুত্রাপি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে না। দুনিয়ার অপর কোন আদর্শ বা ধর্মমতই অনুরূপ দৃষ্টান্তের একশত ভাগের এক ভাগও উপস্থাপন করতে সক্ষম নয়। বস্তুত মুসলিম জনগণ অমুসলিম নাগরিকদেরকে ভাই তুল্য মনে করতেন। কথা বা কাজ যে কোন দিক দিয়ে তাদের সাথে কোনরূপ কষ্টদায়ক আচরণ করাকে তাঁরা সম্পূর্ণ হারাম মনে করতেন। তাঁদের মতে, এ ধরনের আচরণে তাদের মানসিক কষ্টবোধের আশঙ্কা আছে । সূরা 'মুমৃতাহিনা'র নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটিই ছিল এ ক্ষেত্রে তাদের দিগদর্শন ঃ

---

১. আধুনিক গণতন্ত্রের দৃষ্টিতেও কথাটার যৌক্তিকতা প্রনিধানযোগ্য। গণতন্ত্রের সংজ্ঞা হল Majoraity must be gauranteed অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের সিদ্ধান্ত বা মতাদর্শই সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিফলিত হওয়া উচিত। এই সংজ্ঞা অনুসারে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়ন ঘটবে, এটাই স্বাভাবিক। এতে অন্যদের ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার কিছু নেই। কারণ ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের মানবিক অধিকার সর্বতোভাবে সুরক্ষিত।—সম্পাদক

لَايَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ -

আল্লাহ্ তোমাদের নিষেধ করেন না ভাল আচরণ ও ন্যায়পরতামূলক ব্যবহার প্রদর্শন করা থেকে তাদের সাথে, যারা দ্বীন-পার্থক্যের কারণে তোমাদের সাথে লড়াই করেনি এবং যারা তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত করেনি। আল্লাহ্ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন। (সূরা মুমতাহিনা ঃ ৮)

ইসলাম এসব ধর্মাবলম্বীদের আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিল। তারা নিজেদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি কোন প্রকার বাধা-প্রতিবন্ধকতা ব্যতীতই যথাযথভাবে পালন করতে পারত; নিজেদের মত-বিশ্বাসের প্রকাশ ও প্রচার করবার অবাধ সুযোগও পেত। তাদের নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদসমূহ নিজেদের ধর্ম-বিধানের ভিত্তিতে মীমাংসা করে নেয়ার অধিকারী ছিল। সাধারণ রাষ্ট্রীয় ও সামষ্টিক ব্যাপারে তারা রাষ্ট্রের একজন সাধারণ নাগরিকের মতই নির্বিশেষ ও নিরপেক্ষ আচরণ লাভ করত। কেননা তারাও ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মুসলিম নাগরিকদের ন্যায়ই অভিন্ন সম্মান ও মর্যাদা লাভের অধিকারী ছিল। তাদেরও মৌলিক অধিকার ছিল তা-ই, যা ছিল একজন মুসলিম নাগরিকের। তাদের ওপরও সেই সব দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত হত, যা হত মুসলমানদের ওপর।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের নিকট থেকে 'জিযিয়া' নামক একটি বিশেষ ধরনের 'কর' ব্যতীত আর কিছুরই দাবি করা হত না। এই জিযিয়া দান কোনক্রমেই কোন অপমানকর ব্যবস্থা নয়। তাদের সঠিক সংরক্ষণ, অধিকার আদায় ও নিরাপত্তা বিধানের যে দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রকে বহন ও পালন করতে হত, তারই বিনিময়স্বরূপ তাদের নিকট থেকে এই খাতের অর্থ গ্রহণ করা হত। জিযিয়ার পরিমাণ নির্ধারণ ও ধার্য করার দায়িত্ব সব সময়ই সরকারের ওপর ন্যস্ত।

মুসলমানদের ওপর জিযিয়া ধরনের কোন কর ধার্য হত না বটে; কিন্তু তার পরিবর্তে মুসলমানদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হত যাকাত। অমুসলিম নাগরিকদের যাকাত দিতে হত না। অবশ্য জিযিয়া ও যাকাতের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। জিযিয়া একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ধার্য হয়, যাকাতের পরিমাণ অনির্দিষ্ট; কেননা যাকাত আদায়যোগ্য অধিক পরিমাণ সম্পদের মালিকদের নিকট থেকে অধিক পরিমাণে যাকাত আদায় হবে, এটাই স্বাভাবিক। শুধু তা-ই নয়, মুসলমানগণ যাকাত ছাড়াও সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য আরও নানা খাতে অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য হত; অমুসলিমগণের জন্য এই বাধ্যবাধকতা ছিল না।

যাকাত ও জিযিয়ার মধ্যকার আরও একটি পার্থক্য স্মরণীয়। তা হচ্ছে, যাকাত বাবদ প্রাপ্ত সম্পদের অধিকাংশ গরীব-মিসকীনদের জন্য ব্যয় করতে হয়, সাধারণ

জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হয় তার খুব কম অংশ। অথচ জিযিয়া সম্পূর্ণভাবেই ব্যয় করা হয় সাধারণ জনকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কাজে ও প্রকল্পে। 'যাকাত' শব্দের অর্থ কোন জিনিসের পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা বিধান ও প্রবৃদ্ধি সাধন। তা প্রদান করলে অবশিষ্ট মাল-সম্পদ পবিত্র ও হালাল হয়, প্রবৃদ্ধি লাভ করে। এটা ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এর নাম যাকাত রাখা হয়েছেই এই উদ্দেশ্যে যে, আর্থিক প্রয়োজন পূরণের যে দায়িত্ব রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জনগণের ওপর অর্পন করা হয় এবং প্রশাসন ও উন্নয়নের জন্য যেসব অর্থ দেশের সাধারণ নাগরিকদের নিকট থেকে আদায় করা হয়, তা থেকে এই সম্পদ সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যবস্থায় রাখতে হবে। এটি মুসলমানদের দ্বীনি কর্তব্যভুক্ত। তা কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে যথারীতি আদায় করতে হবে এবং তা আদায় করার কর্তব্য এড়িয়ে যেতে কোন ঈমানদার মুসলমানই চেষ্টা করবে না—কোনরূপ অপকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করবে না। যাকাত নারী-পুরুষ-শিশু সর্ব পর্যায়ের লোকদের নিকট থেকেই গ্রহণ করা হয়; কিন্তু জিযিয়া এরূপ নয়।

এ পর্যায়ে স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলামী রাষ্ট্র মাত্রই অমুলিম নাগরিকদের নিকট থেকে জিযিয়া নামক কর অবশ্য অবশ্যই আদায় করতে হবে এমন কোন কথা নেই। কোন অমুসলিম দেশ যুদ্ধ করে জয় করার পর দখলে রাখা হলে সেখানে যারা দ্বীন-ইসলাম কবুল করবে না, অমুসলিম থাকতে চাইবে, জিযিয়া কেবল তাদের নিকট থেকেই গ্রহণ করা হবে—এ কর-এর অন্য কোন নামকরণ করতেও কোন বাধা নেই। কুরআনে এ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে, তার সারমর্ম হল—ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে তার স্মারক স্বরূপ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ রাষ্ট্রের ধন-ভাণ্ডারে নিয়মিত দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে, অন্য কিছু নয়। অমুসলিম নাগরিকগণ যদি জিযিয়া না দিয়ে সাধারণ পর্যায়ের একটা কর দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবে ইসলামী রাষ্ট্র তাদের নিকট থেকে তা-ই গ্রহণ করবে। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারূক (রা)-এর খিলাফত আমলে 'বনু তাগলুব' গোত্রের খৃস্টান জনগণ আবেদন জানিয়েছিল যে, তাদের জিযিয়া দিতে বাধ্য না করে 'সাদকা' নামে দ্বিগুণ অর্থ তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হোক। হযরত উমর (রা) সানন্দে তাদের এই আবেদন গ্রহণ করেছিলেন।

দ্বীন-ইসলাম অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় স্বাধীনতার যে অনির্বচনীয় অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে, তা তার পক্ষে বিরাট গৌরবের বিষয়, সন্দেহ নেই। ইসলামী রাষ্ট্রে তারা সর্বাত্মক নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে পারে। তাদেরকে ধর্মমত পরিবর্তনে বা ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার কোন অধিকারই কারোর থাকতে পারে না। তাদের সম্মানার্হ ধর্মনেতাদের গালাগাল দিয়ে তাদের মনে কোনরূপ কষ্টদানেরও সুযোগ নেই। পক্ষান্তরে ইসলাম তাদের এই অধিকার দিয়েছে যে, তারা শালীনতার সর্বজনবিদিত সীমার মধ্যে থেকে সত্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে মুসলমানদের সাথে তর্ক-বিতর্কেও লিপ্ত হতে পারে। কুরআন মজীদে মুসলমানদেরকে এই পর্যায়ে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

وَلَاتُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ -

তোমরা আহলি কিতাব—অমুসলিমদের সাথে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হলে অতীব উত্তম মানের যুক্তি, অকাট্য ও সুদৃঢ় দলীল-প্রমাণ এবং উত্তম দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ সহকারে তা করবে, তবে জালিমদের এড়িয়ে যেতে হবে। তাদের সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেবে যে, আমাদের জন্য যা কিছু নাযিল হয়েছে আমরা তারই প্রতি ঈমান এনেছি আর তোমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তার প্রতিও। আমাদের ইলাহ তোমাদের ইলাহ আসলে এক ও অভিন্ন। আমরা তাঁরই অনুগত।

(সূরা আল- আনকাবুত ঃ ৪৬)

বস্তুত কুরআন মজীদে এমন অসংখ্য আয়াত রয়েছে, যাতে অমুসলিমদের সাথে ভাল আচার-ব্যবহার করার ও তাদের প্রতি সুবিচার করার সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নবী করীম (স)-কে সম্বোধন করেই বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ط اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ بَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ -

ভাল ও মন্দ কখনও সমান ও অভিন্ন হতে পারে না। হে রাসূল! তুমি খারাপ আচরণের জবাবে সব সময় ভাল আচরণ করবে। তার ফল এই হবে যে, তোমার ও যার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে, সে তোমার সুন্দর আচরণ দেখে তোমার একজন উৎসাহী বন্ধুতে পরিণত হবে। (সূরা হা-মীম আস্—সাজদাহ ঃ ৩৪)

নবী করীম (স)-এর যুগে ইয়াহুদী, নাসারা ও অগ্নিপূজক ছাড়াও মুনাফিকদের একটা শ্রেণী বর্তমান ছিল। তারা অন্তরে ও মনে কুফরের প্রতি অবিচল থাকলেও মুখে ইসলামের প্রতি বিশ্বাস প্রকাশ করত। নবী করীম (স) তাদের বাহ্যিক আচরণকেই গ্রহণ করেছিলেন আর প্রকৃত ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। তবে এদেরকে রাষ্ট্র পরিচালনায় সুযোগদানের ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। নবী করীম (স) কোন দায়িত্বপূর্ণ পদেই তাদের নিযুক্ত করেন নি। তাদের প্রতি কখনও বিশ্বাসও স্থাপন করেন নি—আস্থা বা নির্ভরতারও প্রকাশ করেন নি।

ইসলামী রাষ্ট্রে বিদেশী নাগরিক

ইসলামী রাষ্ট্রে আরব ছাড়াও ইরানী, রোমক, আবিসিনীয় এবং ইয়াহুদীরাও বসবাস করত। তাদের সংখ্যা ছিল খুবই অল্প। তাদের খুব কম সংখ্যক লোকই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ইরানীদের মধ্য থেকে হযরত সালমান ফারসী এবং ইয়ামেনে বসবাসকারী 'আবনা' নামে পরিচিত কিছু সংখ্যক ইরানী ইসলাম কবুল করেছিলেন।

ইসলাম এই সব লোকের সাথে পূর্ণ সাম্যের নীতি ও আচরণ প্রদর্শন করেছে। আরবগণ সংখ্যাগুরু হওয়া সত্ত্বেও বহিরাগত এ সব মুসলমানের ওপর তাদের কোনরূপ শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য ছিল না। শুধু তা-ই নয়, রাসূলে করীম (স)-এর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিকদের মধ্যে কে দেশী, কে বিদেশী—কে স্থানীয়, কে বহিরাগত, কে দেশ-মাতৃকার সন্তান আর কে তা নয়, এ পার্থক্য কোন দিনই করা হয়নি। কেননা নবী করীম (স) সমগ্র বিশ্বমানবতার হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। কেবলমাত্র আরবদের নিকট সত্য দ্বীনের দাওয়াত দেয়াই তাঁর দায়িত্ব ছিল না। নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকেই দ্বীন-ইসলামের দায়াত দেয়া ছিল তাঁর প্রধান কর্তব্য। ফলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অতি স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত মুসলমানকে সম্পূর্ণ সমান ও অভিন্ন মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হল। এই সমাজে মর্যাদা-পার্থক্যের একটি মাত্র মানদণ্ডই স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত ছিল. তা হলো—তাক্ওয়া ও পরহেযগারী। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে এ কথাই স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন ঃ

يَـاَيُّهَـا النَّـاسُ اِنَّـا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَـعَلْنٰكُمْ شُـعُـوْبًـا وَّقَـبَـآئِلَ لِتَـعَارَفُـوْا ط اِنَّ اَكْـرَمَـكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَـاكُمْ ط اِنَّ اللّٰـهَ عَلِـيْمٌ خَـبِـيْرٌ -

হে মানুষ! আমরাই তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে। আর তোমাদের বানিয়েছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্ররূপে, যেন তোমরা পরস্পরকে চি-নতে পার। নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে অধিক সম্মানিত আল্লাহ্র নিকট সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক তাক্ওয়াসম্পন্ন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ অধিক বিজ্ঞ ও সর্বাধিক অবহিত। (আল-হুজরাত ঃ ১৩)

স্বয়ং রাসূলে করীম (স)-ও ঘোষণা করেছেন ঃ

মুসলমানদের সমস্ত লোক চিরুণীর কাঁটাসমূহের ন্যায় সমান। কোন আরবের অনারবের ওপর এবং কোন অনারবের আরবের ওপর তাক্ওয়া ভিন্ন অন্য কোন দিক দিয়েই কোন শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য নেই।

রাসূল প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের মূলনীতি

ইসলামী রাষ্ট্রের মৌল দৃষ্টিকোন হচ্ছে ধর্ম-বর্ণ, বংশ-গোত্র ও জাতীয়তা নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণে কাজ করা, পূর্ণ ন্যায়পরতার সাথে সমস্ত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা, সকলের প্রতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সুবিচার প্রদর্শন করা।

বর্তমান কালের সুসভ্য ও বড় বড় সংস্কৃতিবান জাতিসমূহ নিজদেরকে মানবতার একমাত্র বন্ধু বলে দাবি করছে। অথচ এদের সকলেরই রাষ্ট্রনীতি সংকীর্ণ জাতীয়তা ও দেশ-মাতৃকা-ভিত্তিক। তাদের সামনে রয়েছে নিজেদের স্বমতের ও স্বদেশী লোকদের কল্যাণ, নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের নয়। এসব জাতি বা রাষ্ট্র অন্য মানুষের কোন সাহায্য

যদি কখনও করেও, তবে তা করে একান্তভাবে নিজ স্বার্থে। সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের দোহাই তারা দেয় শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, দুর্বল ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী বা জাতিসমূহকে যেন ধোঁকা দিয়ে নিজেদের দাসত্ব নিগড়ে বন্দী করতে পারে; যেন প্রয়োজনের সময় এ সব জাতির লোকেরা তাদের জন্য যুদ্ধের ময়দানে প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়।

কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (স) উপস্থাপিত আদর্শ দ্বীন-ইসলামে কোনরূপ ধোঁকা-প্রতারণার অবকাশ নেই। তা কোন জাতি বা অঞ্চলের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকাবার অনুমতিও কাউকে দেয় না। অপর কোন দেশের শস্য-শ্যামল-উর্বরা ভূমি বা মহামূল্য খনিজ সম্পদ অথবা নগদ ঐশ্বর্য-বৈভবের প্রতি কোন লোভই মুসলমানদের থাকতে পারে না। ইসলামের লক্ষ্য বিশ্বমানবতার নির্বিশেষ কল্যাণ ও হেদায়েত। ইসলামের দৃষ্টিতে এই কল্যাণ ও হেদায়েত ওতপ্রোতভাবে জড়িত কিংবা বলা যায়, প্রত্যেকটিই অপরটির ওপর নির্ভরশীল। কল্যাণ পেতে হলে হেদায়েত গ্রহণ করতে হবে আর হেদায়েত গ্রহণ করলেই কল্যাণ লাভ সম্ভব। হেদায়েত গ্রহণ ছাড়া যে কল্যাণ ইসলামের দৃষ্টিতে তা ধ্বংসের নামান্তর।

ইসলামী রাষ্ট্র নাগরিকদের মধ্যে পরিপূর্ণ সুবিচার, ন্যায়পরতা ও পূর্ণাঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। জাতীয়তা ও ভাষার দৃষ্টিতে সেখানে নাগরিকদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য সৃষ্টির একবিন্দু সুযোগ নেই। এই রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে অনারবও তেমনই সম্মানার্হ, যেমন আরব। নিগ্রো ও কৃষ্ণাঙ্গের সেই রূপ অধিকার স্বীকৃত, যেমন শ্বেতাঙ্গের। বস্তুত ইসলাম একটা দ্বীন ও আদর্শিক আন্দোলন বিশেষ। তা জাতীয়তাবাদী বা ভাষাভিত্তিক আন্দোলন নয়। এ ধরনের বিতর্কের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্কও নেই।

এ নীতির কারণে ইসলামী রাষ্ট্রে আরবদের ছাড়া অন্যান্য জাতির লোকেরাও বড় বড় রাষ্ট্রীয় পদে অভিষিক্ত হতে পারতেন। তাঁদের আনুগত্য করা নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য কর্তব্য ছিল। সে লোক কোন পশ্চাদপদ বা অবহেলিত জাতির মধ্য থেকে আসা হলেও তাতে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ করা চলত না। নবী করীম (স) স্বীয় বাস্তব কর্মের মাধ্যমেই এই আদর্শকে ভাস্বর করে তুলেছিলেন। হযরত সালমান (রা) একজন ইরানী (পারস্য দেশীয়) ক্রীতদাস ছিলেন। কিন্তু ইসলামী সমাজে তিনি অতীব সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। সুহাইব রুমীও ছিলেন একজন ক্রতীদাস। কিন্তু কি যুদ্ধ কি সন্ধি, কোন অবস্থায়ই তাঁর সাথে পরামর্শ না করে রাসূলে করীম (স) কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন না। হাবশী গোলাম হযরত বিলাল ইবনে রিবাহ সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। ইসলামী রাষ্ট্রে তিনি কেবল মসজিদের মুয়ায্যিনই ছিলেন না, তিনি ছিলেন নবী করীম (স) প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের কোষাধ্যক্ষ। আধুনিক পরিভাষায় বলতে গেলে তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।

এরূপ সুমহান ও অতুলনীয় সাম্যের আদর্শ দুনিয়ায় আর কেউ প্রতিষ্ঠিত করেছে কি?

বিশ্বনবীর সর্বজনীনতা

দ্বীন-ইসলাম হযরত মুহাম্মাদ (স) উপস্থাপিত দ্বীন। তাঁর এই দ্বীনের দাওয়াতের বহু সংখ্যক দিক রয়েছে। বিস্তীর্ণ তার দিগন্ত ও আয়তন। তার গভীরতা অতলস্পর্শ। সে বিষয়ে কথা বলার ও আলোচনা করার অনেক দিক ও ক্ষেত্র থাকা সত্ত্বেও আপাতত রাসূলে করীম (স)-এর দাওয়াতের একটি মাত্র দিক সম্পর্কিত আলোচনার মধ্যেই সীমিত থাকতে চাই এবং সেই একটি দিকের ওপরই সমগ্র লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখতে ইচ্ছা করেছি। সে দিকটি হল, তার দাওয়াতের বিশ্ব-ব্যাপকতা ও বিশ্বজনীনতা। কুরআন মজীদেও এ বিষয়টির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে।

আমরা কুরআনের বিশাল বিস্তীর্ণ পরিমণ্ডলে দাঁড়িয়ে তার বিশ্ব-কেন্দ্রিক ঘোষণাবলী শুনতে পাচ্ছি, যদিও তার নাযিল হওয়ার সময়কাল থেকে আমরা অনেক দূরে পৌঁছে গেছি। কুরআন উদাত্ত কণ্ঠে ও সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিচ্ছে, ইসলাম মৌলিকভাবে একটি বিশ্বাস—একটি প্রত্যয়। সে বিশ্বাস ও প্রত্যয় বিশেষ কোন সময়, সমাজ বা জনসমষ্টির জন্য নির্দিষ্ট নয়। বিশেষ কোন শহর, নগর বা দেশের জন্য একান্তভাবে নির্দেশিত নয়। দ্বীন-ইসলাম পূর্ণাঙ্গ বিধান হিসেবে সকল ব্যক্তি ও সমষ্টির জন্য—জাতি, দেশ, কাল, বর্ণ ও ভাষার দিক দিয়ে তাদের মধ্যে যত পার্থক্যই থাক না কেন; মানব বংশের সকল পর্যায়ে তা বাস্তবায়িত হওয়ার যোগ্য—কোন প্রতিবন্ধকতাই এ পথ আগলে দাঁড়াতে পারে না। জাতীয়তা ও আঞ্চলিকতার প্রতিবন্ধকতাও তথায় স্বীকৃত হতে পারে না। বিশ্বনবীর দাওয়াত ও আন্দোলনের ইতিহাস এবং তার বিস্তৃতি ও সম্প্রসারণের ইতিবৃত্তই এর অকাট্য প্রমাণ।

আমরা যখনই হযরত মুহাম্মাদ (স) উপস্থাপিত দ্বীনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করি, তখন আমাদের চোখের সামনে থেকে অন্ধকারের কুহেলিকা বিলীন হয়ে যায়। কোনরূপ চেষ্টা বা কষ্ট স্বীকার ছাড়াই আমরা সবকিছু স্পষ্টভাবে দেখতে পাই।

রাসূলে করীম (স)-এর দ্বীনী দাওয়াতের প্রথম সূচনা-পর্ব তাঁর বংশ ও পরিবার-পরিমণ্ডলের মধ্যেই আবর্তিত। কেননা আল্লাহ্ই তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ –

এবং তোমার বংশীয় নিকটবর্তী লোকদেরকে সতর্ক কর (আশ্-শু'আরা ঃ ২১৪)

এই নির্দেশের তাৎপর্য খুবই গুরুত্ববহ। আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দূরবর্তী ও অনাত্মীয় লোকেদের তুলনায় নিকটাত্মীয় ও রক্ত সম্পর্কের বা বংশের লোকদের থেকে অধিক আনুকূল্য পাওয়ার সম্ভাবনাকে কোনক্রমেই উপেক্ষা করা চলে না। বিশেষ করে গোত্র-কেন্দ্রিক সমাজ জীবনের সেই সংঘাতময় পরিস্থিতিতে বংশ ও রক্ত সম্পর্কের নৈকট্য বোধের ভাবধারায় এই আনুকূল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

রাসূলে করীম (স) তাঁর দ্বীনী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ের সুদীর্ঘ তিনটি বছরকাল পূর্ণ গোপনীয়তার মধ্যে দিয়েই অতিক্রম করেন। এই সময় তিনি যতটা সম্ভব অপ্রকাশ্যভাবে আপন ও নিকটবর্তী লোকদেরকেই ঈমান গ্রহণে আহ্বান জানাতে থাকেন। সেক্ষেত্রেও তিনি কখনও ইশারা-ইঙ্গিত আবার কখনও সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁর এই দাওয়াতের সাধারণত্ব বা বিশ্বজনীনতাকে লোকদের সম্মুখে স্পষ্ট করে তুলে ধরতেন। তিনি বলতে চাইতেন যে, তাঁর দ্বীন ও শরীয়াত বিশেষ কোন জনগোষ্ঠীর জন্য নির্দিষ্ট নয়, তা দুনিয়ার সর্বসাধারণ মানুষের জন্য, নির্বিশেষে সকলের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য, অনুসরণীয় যেমন, তেমনি সকলের জন্য কল্যাণকরও। এই মুহূর্তে বিশেষ একটা পরিবেষ্টনীর মধ্যে সীমিত হলেও অচিরেই তা সর্বসাধারণ্যে পরিব্যাপ্ত ও পরিব্যক্ত হয়ে পড়বে। তখন তা কোন নির্দিষ্ট বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে না।

রাসূলে করীম (স) নিজের ঘরে তাঁর চাচা-মামা পর্যায়ের ও সম্পর্কশীল ব্যক্তিদের একত্রিত করে সর্বপ্রথম যে দাওয়াত পেশ করেন, প্রামাণ্য ইতিহাসে তা নিম্নোক্ত ভাষায় উদ্ধৃত রয়েছে ঃ

وَاللّٰهِ الَّذِىْ لَآاِلٰهَ اِلَّاهُوَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ خَاصَّةً وَّاِلَى النَّاسِ عَامَّةً وَاللّٰهِ لَتَمُوْتُنَّ كَمَا تَنَامُوْنَ وَلَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُوْنَ وَلَتُحَاسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُوْنَ وَاِنَّهَا الْجَنَّةُ اَبَدًا وَالنَّارُ اَبَدًا - (تاريخ الكامد لابن الاثير ٤١)

যে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ উপাস্য ও মাবুদ নেই তাঁর নামে শপথ করে বলছি, আমি আল্লাহ্র রাসূল রূপে বরিত ও নিয়োজিত হয়েছি বিশেষভাবে তোমাদের জন্য এবং সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের জন্য। আল্লাহ্র নামে শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে, যেমন করে তোমরা নিদ্রা থেকে জেগে উঠ। তখন তোমাদের যাবতীয় কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা হবে। সেই সাথে এ-ও জানবে যে, জান্নাত চিরন্তন, জাহান্নামও চিরস্থায়ী।

অতপর তিনি কিছু সময়ের অবকাশ পেয়ে যান। এই সময়ে তিনি তাঁর দ্বীনি দাওয়াতের দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। তখন তিনি তাঁর প্রতি অর্পিত দ্বীনী দাওয়াতের দায়িত্বের কথা সর্বজন সম্মুখে প্রকাশ করে দেয়ার নির্দেশ পান। সে নির্দেশের ভাষা ছিল এই ঃ

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ

হে নবী! যে কাজের জন্য তোমাকে নির্দেশ করা হয়েছে, তুমি তা বলিষ্ঠভাবে চতুর্দিকে প্রকাশ ও প্রচার করে দাও এবং শিরকে লিপ্ত লোকদের একবিন্দু পরোয়া করো না। (সূরা হিজর ঃ ৯৪)

এই নির্দেশ পেয়ে রাসূলে করীম (স) প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী 'সাফা' পর্বতের শিখরে আরোহন করেন এবং উচ্চৈ কণ্ঠে আওয়াজ দিতে থাকেন ঃ 'হে প্রাতঃকালীন জনতা! আওয়াজ শুনে চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী মক্কার জনতা পর্বতের পাদদেশে সমবেত হয়। তাদের সম্বোধন করে তিনি বলেন ঃ 'আমি যদি তোমাদের বলি যে, এই পাহাড়ের এ পাশে শত্রু পক্ষের একদল অশ্বারোহী দাঁড়িয়ে আছে, এখনই তারা তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তাহলে তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে না?[১] উপস্থিত জনতা সমস্বরে বলে উঠল ঃ 'আমরা আজ পর্যন্ত তোমার মুখে কোন মিথ্যা কথা শুনতে পাইনি, তোমার ব্যাপারে এর কোন অভিজ্ঞতাই আমাদের নেই'।

এই কথা শুনে নবী করীম (স) বললেন ঃ

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَانِّى لَااَغْنِى عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا - اِنِّى لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ اِنَّمَا مَثَلِىْ وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَاىَ الْعَدُوَّ فَانْطَلَقَ يُرِيْدُ اَهْلَهٗ فَخَشِىَ اَنْ يَسْبِقُوْهُ اِلٰى اَهْلِهٖ فَجَعَلَ يَقُوْلُ يَاصَبَاحَاه وَتِيتم اوتيتم - (السيرة الحلبية - ج اص ٣٢١)

হে কুরাইশ বংশের লোকেরা! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। আল্লাহ্ থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করার জন্য আমি কিছুই করতে পারব না—কোন কাজেই আসব না। আমি তো কঠিন আযাব আসার আগে-ভাগে তোমাদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় সাবধানকারী মাত্র। আমার ও তোমাদের ব্যাপারকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে চাইলে মনে কর ঃ এক ব্যক্তি শত্রু বাহিনী দেখতে পেল, সে তার আপন-জনদের সে বিষয়ে সতর্ক করে দেয়ার ইচ্ছা করল। কিন্তু ভয় পেল, শত্রুরা তার আগেই তার আপন-জনের ওপর আক্রমণ করে বসে নাকি। তখন সে নিরুপায় হয়ে চিৎকার দিতে লাগল, হে সকাল বেলার জনগণ! সাবধান হয়ে যাও, নতুবা ধ্বংস হয়ে যাবে।

এ ভাবেই ইসলামী দাওয়াতের সূচনা হয়েছিল। বলা যায়, হাঁটি-হাঁটি পা-পা করেই তা অগ্রসর হচ্ছিল। চতুর্দিকে সমাচ্ছন্ন শিরক ও নাস্তিকতার আবরণ ছিন্ন করেই অতি ধীরে ধীরে তাঁকে অগ্রসর হতে হচ্ছিল। এ সময়ই মক্কা নগরীর কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব দ্বীন-ইসলাম গ্রহণ করেন। বহু সংখ্যক যুবকও তাঁর দাওয়াতের প্রতি আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ হয়। সেই সাথে কুরাইশ সরদাররাও উৎকর্ণ হয়ে উঠে। অবস্থা দেখে তারা

১. পর্বত শিখরে দাঁড়িয়ে একদিকে সমবেত লোকদেরকে সেই পর্বতের অপর দিকে অবস্থিত কোন বিষয়ে সংবাদদান নবীর প্রকৃত অবস্থানের সাথে তাৎপর্যপূর্ণ। নবী এই দুনিয়ার মানুষ হয়েও পরকালীন জীবনের সব কিছু ওহীর সাহায্যে প্রত্যক্ষ করেন যা সাধারণ মানুষের অগোচরে থাকে। যেমন পর্বত শিখরে দাঁড়িয়ে একজন মানুষ অপর দিকের অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

অনেকটা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কেমন করে এই আওয়াজকে নিস্তব্ধ করা যায়, সে চিন্তায় তারা খুবই কাতর হয়ে উঠে। শেষ পর্যন্ত তারা এই আওয়াজকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে মুহাম্মাদ (স)-কেই সম্পূর্ণরূপে খতম করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এজন্য তারা প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে যুবক নিয়ে একটি ঘাতক দল গঠন করে এবং তাদের প্রতি নির্দেশ দেয় যে, তারা একসাথে একই ব্যক্তির ন্যায় আঘাত হানবে, যেন তিনি শেষ হয়ে যান। তাহলে তাঁর বংশ বনু হাশেম বিশেষ কারোর বিরুদ্ধে রক্ত-মূল্যের দাবি করার সাহস পাবে না। সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাও সম্ভব হবে না তাদের পক্ষে। এভাবে কাজ উদ্ধার হয়ে যাবে; কিন্তু সেজন্য কাউকেই কোন ঝামেলা পোহাতে হবে না—সমাজের নিকটও দায়ী হতে হবে না।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলাই তাদের এই ষড়যন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করে দিলেন। তিনি রাসূলে করীম (স)-কে মদীনার পথে মক্কা ত্যাগ করার নির্দেশ দিলেন।

রাসূলে করীম (স) মদীনায় উপস্থিত হলে সেখানকার প্রাচীন অধিবাসী আওস ও খাজরাজ বংশের লোকেরা তাঁর হাতে বায়'আত করলেন, তাঁকে সর্বপ্রকার সাহায্য, সমর্থন ও সহযোগিতা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন; তাঁর প্রতিরক্ষায় সর্বাত্মক শক্তি ব্যয়ের জন্যও ওয়াদাবদ্ধ হলেন, যেমন এর পূর্বে মক্কায় দু' দুবার তারা বায়'আত করেছিলেন।

রাসূলে করীম (স) মক্কা নগর এবং নিজ বংশের লোকদের ত্যাগ করে চলে গেলেও তাঁর বংশের লোকেরা তাঁর পিছু ধাওয়া করা ত্যাগ করেনি। ফলে তাঁর ও কুরাইশদের মধ্যে কয়েকটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাঁকে এবং তাঁর গঠিত ইসলামী সমাজকে পর্যুদস্ত করার উদ্দেশ্যে কুরাইশরা শেষ রক্ত বিন্দু ব্যয় করতেও কুণ্ঠিত হয় নি। এভাবে হিজরতের পর সুদীর্ঘ ছয়টি বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়। এই সময় মক্কার সন্নিকটে 'হুদাইবিয়া' নামক স্থানে হযরত মুহাম্মাদ (স) ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে দশ বছর মিয়াদী একটি সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিকে আল্লাহ তা'আলা 'ফাত্হুম-মুবীন'—অর্থাৎ 'সুস্পষ্ট বিজয়' বা তার সূচনা বলে কুরআন মজীদের আয়াতে ঘোষণা করেন। ফলে নবী করীম (স) দূরবর্তী স্থানসমূহে তওহীদী দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়ার একটা নির্বিঘ্ন সুযোগ পেয়ে যান।

এই সময় তিনি চতুর্দিকে দূত পাঠিয়ে বড় বড় রাজা-বাদশাহ ও শাসকদের নিকট দ্বীন-ইসলাম কবুল করার দাওয়াত পৌছিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। রোমের সম্রাট কাইজার, পারস্য সম্রাট কিস্‌রা, মিশরের কিবৃতী শাসক 'আজীম', হাবশার বাদশাহ গাসানী প্রধান হারিস, সিরীয় রাজা তহুম, ইয়ামামা শাসক হাওদা এবং আরবের বিভিন্ন গোত্রপতি, এমনকি সরকারী কর্মচারী, ধর্ম যাজক প্রভৃতির নিকট দ্বীন-ইসলাম কবুলের আহ্বান সম্বলিত পত্র পাঠিয়ে দেন। তাতে তিনি শান্তির একমাত্র বিধান দ্বীন-ইসলাম কবুল করার ও তাঁকে আল্লাহ্র রাসূল রূপে মেনে নেয়ার আমন্ত্রণ জানান।

এসব পত্র ও আহ্বান অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, বিশ্বনবী (স)-এর দাওয়াত ও দ্বীন ছিল বিশ্বজনীন। সমগ্র পৃথিবীর জন্যই তা ছিল আল্লাহ্র প্রেরিত সর্বশেষ দ্বীন এবং

তিনি ছিলেন সমস্ত মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র সর্বশেষ রাসূল। প্রেরিত পত্রসমূহের ভাষা ও বক্তব্য থেকেও এ কথাই প্রতিভাত হয়ে উঠে।

স্যার টমাস আরনল্ড বলেছেন ঃ এই সব চিঠি যাদের নিকট পাঠানো হয়েছিল, তাদের ওপর এর বিরাট প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। কালের স্রোত অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে যে, উক্ত পত্রসমূহে যা কিছু বলা হয়েছিল তা কিছুমাত্র শূন্যগর্ভ ছিলনা। এই চিঠিগুলো অধিকতর স্পষ্টতা ও তীব্রতা সহকারে সেই সত্যকেই প্রমাণ করেছে, যার কথা কুরআন বারবার দাবি হিসেবে পেশ করেছে। আর তা হচ্ছে, সকল মানুষের প্রতি দ্বীন-ইসলাম কবুল করার আহবান। (আদ-দাওয়াত ইলাল ইসলাম, পৃষ্ঠা ঃ ৩৪)

প্রেরিত পত্রসমূহের প্রতিক্রিয়া ঃ

নবী করীম (স) প্রেরিত উক্ত দাওয়াতী পত্রসমূহ যে শূন্যগর্ভ উদ্দীপনায় ভরপুর ছিল না, তার বড় প্রমাণ হচ্ছে, পত্রসমূহ প্রাপক ব্যক্তিদের মধ্যে বিচিত্র ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। তাদের অনেককে তা বিশ্রামের শয্যা থেকে তীব্র কষাঘাতে জাগিয়ে দিয়েছিল; অনেককে তা অন্ধত্ব ও নিষ্ক্রিয়তার গহ্বর থেকে বাইরে ঠেলে দিয়েছিল। রাসূলে করীম (স)-এর সে দাওয়াত সম্পর্কে সকলেই কমবেশী ভাবিত হয়ে পড়েছিল। কেউ কেউ তাঁর নবুয়্যাতকে অবনত মস্তকে মেনে নিয়েছিলেন—ঈমান এনেছিলেন রাসূলে করীম (স) উপস্থাপিত দ্বীনের প্রতি। কেউ কেউ মহামূল্য হাদীয়া তোহফাও লোক মারফত পৌঁছে দিয়েছিলেন রাসূলে করীম (স)-এর দরবারে। এ পর্যায়ে সীরাতুন্নবী ও ইসলামের ইতিহাস পর্যায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থাবলীতে বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে।

রোমান সম্রাট কাইজারের ভাই তাকে বলল, ফেলে দাও ও চিঠি। তখন কাইজার তার ভাইকে লক্ষ্য করে বলল ঃ

এমন ব্যক্তির চিঠি কি করে ফেলে দিতে পারি, যার নিকট সবচাইতে বড় ফেরেশতা (জিবরাইল) যাতায়াত করেন।

দরবারে উপস্থিত কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানকে সম্বোধন করে বলল ঃ

তুমি যা বলছ তা যদি সত্য হয়, তা হলে কোন সন্দেহ নেই, তিনি একজন নবী। তাঁর কর্তৃত্ব তো আমার পায়ের তলার জমিন পর্যন্ত অবশ্যই পৌঁছে যাবে।

রোমান বিপশ পত্র পাঠান্তর গীর্জায় পৌঁছে বহু লোকের সামনে বলল ঃ

হে রোমান জনতা, আমাদের নিকট 'আহমাদ'-এর একখানি পত্র এসেছে। তাতে তিনি আমাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি ঃ আল্লাহ্ ছাড়া কেউ উপাস্য নেই এবং আহমাদ আল্লাহ্‌র রাসূল।

'মুকাউকাস' বলেছিলেন ঃ এই নবীর ব্যাপারটি নিয়ে আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছি। তিনি পরিত্যজ্য কোন কাজ করার আদেশ করেন না এবং মনের আগ্রহের কোন জিনিস নিষেধও করেন না। তাঁকে পথভ্রষ্ট, জাদুকর রূপেও দেখতে পাই না—মিথ্যাবাদী গণক রূপেও না।

কাইজারের নিয়োজিত আম্মানের কর্মকর্তা রাসূলে করীম (স)-এর প্রতি একখানি পত্র পাঠিয়েছিলেন। তাতে তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা অকপটে প্রকাশ করেছিলেন। অবশ্য কাইজার তা জানতে পেরে তাঁকে পাকড়াও করল এবং ইসলাম ত্যাগ করার নির্দেশ দিল। কিন্তু তা মানতে তিনি অস্বীকার করলেন। তখন কাইজার তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিল। তিনি যখন নিহত হচ্ছিলেন, তখন কবিতার একটি ছত্র পড়ে জানিয়ে দিয়ে গেলেন ঃ 'মুসলিম সমাজকে জানিয়ে দাও, আমি একজন মুসলিম, আমার হাড়-মাংস সবই আমার রব্ব-এর জন্য একান্ত অনুগত'।

ইয়ামামার রাজা হাওদা ইবনে আলী রাসূলে করীম (স)-এর নিকট একখানি পত্র পাঠিয়ে জবাব দিয়েছিলেন; লিখেছিলেন ঃ 'আপনি যে দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছেন, তা কতইনা সুন্দর, কতইনা উত্তম'। বাহরাইনের শাসক মুনযির ইবনে সাভী রাসূলে করীম (স)-এর দাওয়াত কবুল করেছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের কথাও তাতে প্রকাশ করেছিলেন।

হিময়ারের শাসকগণ এবং নাজরানের পাদ্রীগণও ইতিবাচক জবাব দিয়েছিলেন। কিসরা'র ইয়ামেনে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণ, হাযরা মওত-এর শাসক, আইলার বাদশাহ ও ইয়াহুদীগণ ইসলাম গ্রহণ অথবা জিজিয়া আদায় করতে রাজী হওয়ার কথা জানিয়েছিল।

হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী তাঁর ঐতিহাসিক চিঠিতে ইসলাম কবুলের কথা এতটা দৃঢ়তার সাথে প্রকাশ করেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে নবী করীম (স) তাঁর গায়েবানা জানাযাও পড়েছিলেন। এখানে আমরা শুধু নমুনা স্বরূপ প্রেরিত পত্রসমূহের কয়েকটি মাত্র প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ করলাম। এ হচ্ছে বিপুলের মধ্য থেকে অতি সামান্য ও অতি অল্প কয়েকটির কথা। এসব থেকে শুধু এটুকু প্রমাণ করাই এখানে আমাদের উদ্দেশ্য যে, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর দীর্ঘ দাওয়াত এবং তাঁর মহান নবুয়্যাত ও রিসালাত ছিল বিশ্বজনীন। তা কোন এক দেশ বা এলাকা বা জাতিগোষ্ঠীর জন্য একান্তভাবে নির্দিষ্ট ছিল না।

রাসূলে করীম (স)-এর প্রেরিত দ্বীন কবুলের দাওয়াতী পত্রাদির প্রতিক্রিয়া উল্লেখ প্রসঙ্গে পারস্য সম্রাট কিস্‌রার প্রতিক্রিয়াটা অনুল্লেখিত থাকা ঠিক হবেনা বিধায় আমাদের স্মরণ করতে হচ্ছে যে, কিস্‌রা তার পূর্ববংশ সামানীদের উত্তরাধিকারী হিসেবেই সিংহাসনে আসীন হয়েছিল। সে রাসূলে করীম (স)-এর দ্বীন কবুলের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিল—একজন আরবের 'অধীনতা'(!) মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, দ্বীন-ইসলামের এই দাওয়াতকে সে ব্যক্তিগতভাবে নিজের জন্য এবং তার সিংহাসনের জন্য খুবই বিপজ্জনক মনে করেছিল।

এ কারণে সে রাসূলে করীম (স)-এর পত্রখানি টুকরা টুকরা করে ফেলেছিল। ইয়ামেনে নিযুক্ত তার শাসনকর্তা 'বাযান'কে লিখে পাঠাল যে, তুমি হিজাজের এই ব্যক্তির [নবী করীম (স)] নিকট দু'জন লোক পাঠিয়ে দাও। তারা যেন তাঁকে ধরে আমার নিকট নিয়ে আসে। (الكامل ج ٢، ص ٨١) (السيرة الحلبية ج ٣، ص ٢٧٨)

বস্তুত এ হচ্ছে বিশ্বের চতুর্দিকে রাসূলে করীম (স)-এর দ্বীন কবুলের আহ্বানের এক ধরনের প্রতিক্রিয়া। এসব থেকে স্পষ্টত জানা যায় যে, তাঁর দাওয়াত ছিল বিশ্বজনীন, তিনি ছিলেন বিশ্বনবী, বিশ্বের সকল দেশের, সকল কালের, সকল মানুষের জন্য নবী ও রাসূল। কেননা যারা সে দাওয়াত কবুল করেছিলেন, তারা এ দ্বীনকে সকল মানুষের গ্রহণযোগ্য মনে করেই গ্রহণ করেছিলেন আর যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারাও তাকে তাই মনে করেই প্রত্যাখ্যান করেছিল। নতুবা কোন জাতীয়তাবাদী ধর্ম অন্য জাতির লোকদের জন্য না গ্রহণের প্রশ্ন উঠে, না প্রত্যাখ্যানের।

বিশ্বজনীন রিসালাত প্রমাণকারী আয়াত ঃ

এ পর্যায়ে আমরা কুরআন মজীদ থেকে সে সব আয়াত বাছাই করে উদ্বৃত করব, যা থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হবে যে, রাসূলে করীম (স)-এর রিসালাত ছিল বিশ্বজনীন, ছিল সমগ্র বিশ্বের সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য। তা যেমন কোন বিশেষ দেশ বা অঞ্চল কিংবা ভাষা, বর্ণ বা বংশের লোকদের জন্য ছিল না, তেমনি কেবল এক কালের লোকদের জন্যও ছিল না। তা ছিল সারা পৃথিবীর সকল কালের, সকল মানুষের জন্য সমানভাবে গ্রহণীয় ও অনুসরণীয়। তিনি সর্ব মানুষের সার্বিক কল্যাণ বিধানের জন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন। এ পর্যায়ে নিম্নে কুরআন মজীদের আয়াতসমূহ কয়েকটি ভাগে উদ্ধৃত করা হচ্ছে ঃ

প্রথম ঃ বহু সংখ্যক আয়াত স্পষ্ট ভাষায় বলছে যে, তাঁর রিসালাতের পরিধি সারা বিশ্বব্যাপী। তিনি সর্ব মানুষের প্রতিই আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল। আল্লাহ্ তাঁকে সমগ্র বিশ্বলোকের রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন।

قُلْ يَـاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا –

বল, হে লোকসকল! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলে প্রতি প্রেরিত আল্লাহ্‌র রাসূল।

(আল-আ'রাফ ঃ ১৫৮)

وَمَـا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا –

আমরা তোমাকে সমগ্র মানুষের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপেই পাঠিয়েছি (অন্যকোন রূপে নয়)। (সূরা সাবা ঃ ২৮)

وَاَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلاً ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا–

আমরা তোমাকে মানুষ মাত্রের জন্য রাসূল রূপে পাঠিয়েছি। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। (আন্-নিসা ঃ ৭৯)

وَمَـا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ –

আমরা তোমাকে সমগ্র বিশ্বলোকের জন্য রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি।

(আল-আম্বিয়া ঃ ১০৭)

تَبَارَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا–

মহান পবিত্র বরকতওয়ালা সেই আল্লাহ্, যিনি পার্থক্যকারী কিতাব নাযিল করেছেন তাঁর বান্দাহ্র ওপর, যেন সে সমগ্র বিশ্বলোকের জন্য সতর্ককারী হতে পারে।

(আল্ ফুরকান ঃ ১)

وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ ۢ بَلَغَ –

এবং আমার প্রতি ওহী করে এই কুরআন নাযিল করা হয়েছে যেন আমি তদ্দারা তোমাদেরকে এবং সেই লোকদেরকেও যাদের নিকট তা পৌছবে—সতর্ক করতে পারি। (আল-আন'আম ঃ ১৯)

هُوَالَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ –

তিনিই মহান আল্লাহ্, যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়েতের বিধান ও সত্য অনুসরণ ও অধীনতার ব্যবস্থাসহ পাঠিয়েছেন, যেন সে তাকে সমগ্র আনুগত্য ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী করে দিতে পারে। (আস্-সাফ ঃ ৯)

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْجَآءَ كُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ –

হে মানুষ! এই রাসূল তোমাদের নিকট তোমাদের রব্ব-এর নিকট থেকে সত্য বিধান নিয়ে এসেছে। অতএব, তোমরা (তার প্রতি) ঈমান আন, তা তোমাদের জন্য অতীব কল্যাণকর। (সূরা আন-নিসা ঃ ১৭০)

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ –

এ গ্রন্থ তোমার প্রতি হে নবী—এজন্য নাযিল করেছি যেন তুমি মানুষকে পুঞ্জীভূত অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে বের করে আনতে পার সেই লোকদের রব্ব-এর অনুমতিক্রমে। (সূরা ইব্রাহিম ঃ ১)

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ –

এই কিতাব সমগ্র মানুষের জন্য প্রকাশ্য বর্ণনা এবং হেদায়েতের বিধান এবং মুত্তাকী লোকদের জন্য উপদেশ। (আলে-ইমরান ঃ ১৩৮)

কেবল এই ক'টি আয়াতই নয়, আরও বহু সংখ্যক আয়াত রয়েছে, যা সুস্পষ্ট ও আকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, এই কুরআন যেমন সর্ব মানুষের জন্য, হযরত মুহাম্মাদ

(স)-এর নবুয়্যাত ও রিসালাতও সর্ব মানুষের জন্য। এ পর্যায়ের কিছু আয়াত এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

হে মানুষ! তোমরা সকলে তোমাদের সেই রব্ব-এর দাসত্ব কবুল কর—দাস হয়ে থাক—যিনি তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকেও; এই আশায় যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করার নীতি গ্রহণ করবে। (আল-বাকারা ঃ ২১)

يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلاً طَيِّبًا وَّلَاتَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ -

হে মানুষ! তোমরা আহার কর পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা থেকে হালাল, উত্তম-উৎকৃষ্টরূপে আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু। (আল-বাকারা ঃ ১৬৮)

উদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ে সুস্পষ্ট ভাষায় ঃ ‘হে মানুষ ’ (يَاَيُّهَا النَّاس) বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ফলে এ সম্বোধনের আহ্বান মানুষ পদবাচ্য সকলেরই জন্য, সকলেরই প্রতি। বিশেষ কোন অংশের মানুষের জন্য নয়। এতে একথাও প্রমাণিত হয় যে, কুরআন এবং হযরত মুহাম্মাদ (স) যে দ্বীন পেশ করেছেন—অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম, তা সকল মানুষের জন্য যেমন, তেমনি তাঁর নবুয়্যাত ও রিসালাত সর্বকালের, সর্বমানুষের জন্য। ইসলাম বিশ্বজনীন দ্বীন। যদি তা না হত, তাহলে কুরআনে এরূপ সম্বোধন উদ্ধৃত হওয়ার কোন তাৎপর্যই থাকত না। অথচ কুরআনের ষোলটি আয়াতে ‘হে মানুষ’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

তাছাড়া ‘আহলি কিতাব’—অর্থাৎ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরও সম্বোধন করা হয়েছে কুরআন মজীদের মোট বারটি আয়াতে। ওরা তো কোন-না-কোন ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী ছিল; আসমানী কিতাবের ধারক হিসেবে পরিচিতও ছিল ওরা। ওদেরকে সরাসরি সম্বোধন করে রাসূলের প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানানর কি অর্থ হতে পারে? তাতে এটাই বুঝা যায় যে, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবী-রাসূল হিসেবে প্রেরিত হওয়ার পর নির্বিশেষে সকল মানুষকে তাঁরই প্রতি ঈমান আনতে হবে, কেননা পূর্বের সব নবী ও রাসূলের নবুয়্যাত ও রিসালাতের মিয়াদ নিঃশেষ হয়ে গেছে। অতপর অন্য কারোর নবুয়্যাত বা রিসালাত চলতে পারে না।

উপরন্তু কুরআনের বহু সংখ্যক আয়াতে সাধারণ বিষয়ের অবতারণা করে বহু সংখ্যক বিধান পেশ করা হয়েছে; সে বিধান বিশেষ কোন বর্ণ, বংশ বা দেশের

লোকদের জন্য নয়। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, রাসূলে করীম (স) পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বসবাসকারী সকল মানব সমাজের সংশোধন ও পুনর্গঠনের দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁর রিসালাত কোন বিশেষ সীমার মধ্যেই সীমিত বা সংকুচিত ছিল না। এ পর্যায়ের কতিপয় আয়াত ঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا –

আল্লাহ্‌র জন্য আল্লাহ্‌র ঘরের হজ্জ করা সাধারণভাবে সব মানুষেরই কর্তব্য তবে যারা সেই পর্যন্ত যাতায়াতের সামর্থ্যবান। (আল-ইমরান ঃ ৯৭)

এ আয়াতের বক্তব্য হল, যে মানুষ আল্লাহ্‌র ঘর পর্যন্ত যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক ও অর্থনৈতিক সামর্থ্যের অধিকারী হবে, তাকেই এই ঘরের হজ্জ করতে হবে। আল্লাহ্‌র জন্য তা একান্তই কর্তব্য এবং এ কর্তব্য উক্ত গুণের অধিকারী প্রতিটি মানুষেরই—সে মানুষ যে দেশের, যে বংশের ও যে কালেরই হোক না কেন। কুরআনের আয়াতে এই কর্তব্য কেবল আরবদের জন্য বা কেবল সে কালের লোকদের জন্য, এমন কথা বলা হয়নি।

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَ نِ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ –

মসজিদে হারাম, যা আমরা সমস্ত মানুষের জন্য বানিয়েছি, তথায় স্থানীয় বাসিন্দা ও বহিরাগতদের অধিকার সম্পূর্ণরূপে সমান। (আল-হাজ্জ ঃ ২৫)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ –

লোকদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে যারা মন-ভুলানো কথা খরিদ করে আনে, যেন সঠিক জ্ঞান ব্যতিরেকেই আল্লাহ্‌র পথ থেকে লোকদের ভ্রষ্ট করা যায়।

(সূরা-লুকমান ঃ ৬)

এখানে কথার ধরন যা-ই হোক, সমস্ত মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র পথ থেকে গুমরাহকারী যে কোন মন-ভুলানো কালাম বা কথা ক্রয় করা বা তার ব্যবহার করা ইসলামী শরীয়াতে সম্পূর্ণ হারাম এবং এ হারাম সকল মানুষের জন্য। গায়ক-গায়িকা, নৃত্যশিল্পী বা যৌন সুরসুরি দানকারী নভেল-নাটক থেকে শুরু করে সকল প্রকারের অশ্লীল কাজ এ আয়াত অনুযায়ী সম্পূর্ণ হারাম। কেননা আয়াতে আল্লাহ্‌র দিক থেকে মন-ভোলানো যে-কোন জিনিসকে সকল মানুষের জন্যই সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

চতুর্থ ঃ কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় বলছে যে, তার হেদায়েত বিশেষভাবে কোন সমাজ বা জন-সমষ্টির জন্য নয়, বিশেষ কোন কাল বা সময়ের লোকদের জন্য নয়; বরং আসমানের নীচে জমিনের বুকে অবস্থানকারী সমস্ত মানুষের জন্য সাধারণ। এ পর্যায়ে কতিপয় আয়াত ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا النَّاسُ قَدْجَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا –

হে মানুষ! তোমাদের নিকট তোমাদেরই রব্ব-এর নিকট থেকে অকাট্য দলীল এসে গেছে এবং আমরা তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট আলো অবতীর্ণ করেছি।

(আন-নিসা ঃ ১৭৪

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنَ هُدًى لِّلنَّاسِ –

রমযান মাস, তাতেই নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্য হেদায়েতের বিধান হিসাবে কুরআন নাযিল হয়েছে। (আল-বাকারা ঃ ১৮৫)

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ –

আমরা এই কুরআনে জনগণের জন্য নানা রকম ও নানা প্রকারের দৃষ্টান্ত ও উপমা পেশ করেছি এই আশায় যে, তারা সম্ভবত তা থেকে বিশেষভাবে উপদেশ গ্রহণ করবে। (সূরা-যুমার ঃ ২৭)

اَلْكِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ –

এই গ্রন্থ, তা তোমাদের প্রতি আমরা এজন্য নাযিল করেছি, যেন তুমি লোকদেরকে পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মধ্য থেকে আলোকের দিকে বের করে নিয়ে আসতে পার।

(সূরা-ইব্রাহীম ঃ ১)

এ কটি আয়াতই উদাত্ত কণ্ঠে জানাচ্ছে যে, কুরআন সকল মানুষের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এটি সকলেরই জন্য আলো; অজ্ঞানতা ও পাপ বৃদ্ধির সূচিভেদ্য অন্ধকার থেকে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে এই কুরআন এবং তা বিশেষভাবে কারোর জন্যই নয়, নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যই। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াতাংশটিও স্মরণীয় ঃ

وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ....

আর এই রাসূলের আগমন অনান্য সেই লোকদের জন্যও, যারা এখনও তাদের সাথে এসে মিলিত হয়নি (অর্থাৎ পরে এসে মিলিত হবে)। (আল-জুম'আ ঃ ৩)

এই 'অন্যান্য লোক' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? নিশ্চয়ই সেইসব লোক যারা উত্তরকালে কিয়ামত পর্যন্ত আরব-অনারব নির্বিশেষে এসে এই মুসলিমদের সাথে ঈমানের ভিত্তিতে মিলিত হবে। ফলে এই আয়াতাংশও রাসূলে করীম (স)-এর বিশ্বজনীন ও চিরন্তন নবুয়্যাত ও রিসালাতের কথাই প্রমাণ করছে। সেই সাথে একথাও প্রকারান্তরে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর এ নবুয়্যাত ও রিসালাত পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত

দীর্ঘায়িত ও সম্প্রসারিত। অতপর অপর কোন নবী বা রাসূলের আগমনের কোন সম্ভাবনারই প্রশ্ন উঠতে পারে না; তার কোন অবকাশই নেই।

এসব আলোচনার সারকথা এই দাঁড়ায় যে, রাসূলে করীম (স)-এর রিসালাত ও নবুয়্যাতের বিশ্বজনীনতা ও সর্বজনীনতা অবশ্য স্বীকৃতব্য। তা না কোন জাতীয়তা ও আঞ্চলিকতার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ, না কাল ও যুগের সীমা দ্বারা পরিবেষ্টিত। ওপরের যে চার পর্যায়ের আয়াত উদ্ধৃত করা হয়েছে, তার প্রথম পর্যায়ের আয়াত প্রমাণ করছে রাসূলে করীম (স)-এর রিসালাতের সর্বজনীনতা, দ্বিতীয় পর্যায়ের আয়াত প্রমাণ করে মৌলিক ও খুঁটিনাটি সব ব্যাপারেই কুরআনী সম্বোধনের সাধারণত্ব; তৃতীয় পর্যায়ের আয়াত স্পষ্ট করে যে, বিভিন্ন সাধারণ শিরোনামের অধীনে দেয়া হুকুম-আহকাম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্য। আর চতুর্থ পর্যায়ের আয়াত দেখাচ্ছে যে, কুরআনের হেদায়েত ও সতর্কীকরণ বিশেষ কোন জাতি ও জনগোষ্ঠীর জন্য নয়, বরং সকল মানুষের জন্য নির্বিশেষে।

ভিন্নতর দৃষ্টিকোণে রাসূলের সর্বজনীনতা

রাসূলে করীম (স)-এর রিসালাতের সর্বজনীনতা ভিন্নতর দৃষ্টিকোণেও বিবেচ্য। এই দৃষ্টিকোণটিও ইসলামের প্রকৃতির সাথে পরাপুরি সামঞ্জস্যশীল। বিশ্বলোক, জীবন ও মানুষ এবং আইন প্রণয়ন ও শরীয়াতের বিধান রচনার দিক দিয়েও ইসলামী দৃষ্টিকোণের ব্যাপক বিশালতা লক্ষ্যণীয়।

বস্তুত ইসলাম তার আইন-বিধান নির্ধারণ এবং মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ চিন্তায় মানবতার সেই সাধারণ প্রকৃতির ওপর অধিক নির্ভরতা গ্রহণ করেছে, যার ওপর সমস্ত মানব বংশের সৃষ্টি ও সংগঠন বাস্তবায়িত হয়েছে, যা মানুষের সমস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে একেবারে অতি সাধারণ ও সকলের মধ্যেই পরিব্যাপ্ত। কেউই তার বাইরে নয়। এ দিক দিয়ে দুনিয়ার কোন অঞ্চলের মানুষের সাথে অপর অঞ্চলের বা কোন সময়-কালের মানুষের সাথে অপর সময়কালে মানুষের বিন্দুমাত্র পার্থক্যও নেই। আর ইসলাম যখন সকল মানুষের এই অভিন্ন প্রকৃতি ও জন্মগত স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখেই বিধান পেশ করেছে, তখন সে বিধান গ্রহণ ও পালনের দায়িত্বের দিক দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে বা বিভিন্ন সময়-কালের মানুষের মধ্যে পার্থক্য করা হবে কেন? কেন বলা হবে, ইসলাম কেবল অমুক এলাকার বা অমুক সময়ের লোকদের জন্য আর অমুক অমুক এলাকার বা অমুক অমুক সময়ের লোকদের জন্য নয়? ইসলামের ব্যাপারে এই ধরনের কথা নিতান্তই যুক্তিহীন।

কেননা নবী করীম (স)-এর উপস্থাপিত জীবন-বিধান—দ্বীন-ইসলামের ব্যাপক ভিত্তিকতা ও দিক-বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যায় যে, মানুষের জীবনে যত দিক, যত বিভাগ ও যত সমস্যাই থাকতে পারে, রাসূলে করীম (স) তার কোন একটি দিক, বিভাগ বা সমস্যাই বাদ দিয়ে—উপেক্ষা করে কথা বলেননি, বরং সকল দিক, বিভাগ ও সমস্যা সম্পর্কেই কথা বলেছেন। এ দিকটাও অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, রাসূলে করীম (স) সর্বজনীন—সকল মানুষের জন্যই নবী ও রাসূল ছিলেন। কোন

বিশেষ শ্রেণীর বা বিশেষ সমস্যায় জর্জরিত জনগণের সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁর আগমন হয়নি।

এ বিষয়ে যত চিন্তা-বিবেচনাই করা হবে, নিঃসন্দেহে দেখা যাবে যে, ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তার মহামূল্য শিক্ষা, বিশ্বাসগত সূক্ষ্ম তত্ত্ব এবং আইনগত রীতিনীতি বারবার বিবেচনা করলেও কিছুতেই বোঝা যাবে না যে, তা বিশেষ কোন যুগের বা এলাকার জন্য নির্দিষ্ট। তাঁর উপস্থাপিত শরীয়াতের বিধানও নয় সীমিত বা সীমাবদ্ধ। কেননা আঞ্চলিক ভিত্তিতে যে জীবন বিধান রচিত হয়, তার বিশেষ কতকগুলি চিহ্ন বা নিদর্শন থাকে। প্রথমত তাতে থাকবে বিশেষ পরিবেশগত বিশেষত্ব কিংবা থাকবে স্থানীয় বিষয়ের বৈশিষ্ট্য—এভাবে যে, সে পরিবেশ বদলে গেলে কিংবা সেই বিশেষত্ব না থাকলে বা সেই বৈশিষ্ট্য তিরোহিত হলে সে জীবন বিধান কার্যকর হতে পারে না, তদনুযায়ী জীবন যাপন করাও সম্ভব হবে না। তখন তা মরীচিকায় পরিণত হয়। তার কল্যাণকর ব্যবস্থাদিও ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। কিন্তু ইসলামে সে রকম চিহ্ন বা নিদর্শন কিংবা লক্ষণাদি পাওয়া যায় কি?

এ পর্যায়ে আমরা অনায়াসেই জ্ঞান ও আমলের ক্ষেত্রে ইসলামের উপস্থাপিত কতিপয় বিষয় পর্যালোচনার জন্য গ্রহণ করতে পারি। তাহলে এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য আরো সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে উঠবে। সর্বাগ্রে আমরা আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআন মজীদকে এই পর্যালোচনার কষ্টিপাথরে যাঁচাই করতে পারি। বস্তুত কুরআন হচ্ছে এক চিরন্তন মুজিজা। চৌদ্দশ' বছর ধরে তা এই দুনিয়ায় জ্ঞানের আলো বিতরণ করে আসছে। দুনিয়ার মানুষ যখন অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তখনই কুরআন তার দিকপ্লাবী আলোকচ্ছটা বিকীরণ করেছে। মানুষ হারিয়েছিল তার মনুষ্যত্ব, মানবিক মর্যাদা, তার মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা। মানুষের পরস্পরের মধ্যে ছিল প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মারমারি ও রক্তপাত। চতুর্দিকে ছিল জংলী ব্যবস্থা। মানুষ ছিল ভীত-সন্ত্রস্ত।

এ পরিস্থিতিতেই কুরআন অবতীর্ণ হতে শুরু করে। তা উজ্জ্বল করে ধরে বিশ্ব উজ্জ্বলকারী আলোকচ্ছটা। মানুষকে ফিরিয়ে দেয় তার মনুষ্যত্ব, মানবিক মর্যাদা ও অধিকার। সামাজিক-সামষ্টিক ন্যায়বিচার ও ইনসাফের ভিত্তিতে গড়ে তোলে মানুষের এক একটি সমাজ—কেবল আরব উপদ্বীপেই নয়, তার বাইরে, প্রায় সকল দেশে। ইসলামের শিক্ষা, আইন-বিধান, আদেশ-নিষেধ, রীতি-নীতি ও কর্তব্য সকল সমাজের জন্যই নির্বিশেষ মানবীয় কল্যাণের বিধায়ক। সে কল্যাণ লাভে কোন এক অঞ্চলের লোকদের অপর অঞ্চলের লোকদের অপেক্ষা অধিক সুবিধাভোগী এবং অপর কোন অঞ্চলের লোকদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে দেখা যায়নি। কোন এলাকার লোক ইসলাম গ্রহণ করে সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পেরেছে আর অপর জনসমষ্টি গুমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছে, এমনটাও কখনো ঘটেনি।

তার কারণ, ইসলাম এক নির্ভুল জীবন-দর্শন উপস্থাপন করেছে: খালেস তওহীদী আকীদাই হচ্ছে তার মৌল ভাবধারা আর তা-ই হচ্ছে সাধারণভাবে সমস্ত মানব সমাজের সংশোধনের নির্ভুল উপায়।

ইসলাম সকল প্রকারের শিরক তথা শিরকী আকীদার ওপর আঘাত হেনেছে। মূর্তি-পূজা বা আকাশমার্গীয় অবয়বের আরাধনা-উপাসনা বন্ধ করেছে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য শক্তির সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়েছে। আল্লাহ ছাড়া অন্য শক্তির নিকট নতি বা আনুগত্য স্বীকারের সমস্ত রীতি-ব্যবস্থাকে খতম করেছে, শিরক-এর সমস্ত বন্ধন ও প্রভাব থেকে মানব সমাজকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। গুমরাহীর সমস্ত ফাঁদ থেকে মানুষকে রক্ষা করেছে। প্রস্তর পূজা, অগ্নিপূজা ও পশু পূজার অর্থহীনতাকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে। কেননা এগুলোর ভালো বা মন্দ—ক্ষতি বা উপকার কিছুই করার একবিন্দু ক্ষমতা নেই। পশুগুলো এতই অক্ষম যে, ওরা নিজেদেরকেও রক্ষা করতে পারে না। মানুষ পূজার, মানুষের গোলামী করার এবং বলবান মানুষের মনগড়া আইন পালনের অন্তঃসারশূন্যতাকেও সুস্পষ্ট করে তুলেছে। ফলে মানুষ ফিরে পেয়েছে তার মর্যাদা ও মাহাত্ম্য। এ ক্ষেত্রে আরব উপদ্বীপ ও তার বাইরের মানুষের মধ্যে বিন্দুমাত্র তারতম্যও দেখা যায়নি। তা ছিল নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতিই ইসলামের উদার অবদান।

ইসলামের এই জ্ঞান-পরিচিতি—এই তওহীদী আকীদা তো এমন নয় যে, তা কোন বিশেষ এলাকার মানুষ গ্রহণ করতে পারে আর অপর এলাকার মানুষেরা তা গ্রহণ করতে পারে না।

সূরা আল-হাদীদের শুরুর আয়াত ক'টি গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পাঠ করলে যে কেউ স্পষ্টত অনুভব করবে এবং স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, এ আয়াত ক'টির শিক্ষা অতীব উন্নতমানের এবং অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ। তা কখনই বিশেষ এলাকার লোকদের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হতে পারে না। অন্য এলাকায় তা বাস্তবায়িত হওয়ার অযোগ্যও নয় কোন একটি দিক দিয়েও।

> সে আয়াত ক'টির বাংলা অনুবাদ হচ্ছে ঃ আল্লাহ্র প্রশংসা করছে প্রত্যেকটি জিনিসই যা ভূমণ্ডল ও আকশমণ্ডলে রয়েছে। ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডলের রাজত্ব ও সার্বভৌমত্বের নিরংকুশ মালিক একমাত্র তিনিই। জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন কেবল তিনিই এবং সব কিছুরই ওপর তিনিই শক্তিমান।

ইসলামের যাবতীয় হুকুম-আহ্কাম, ইবাদত ব্যবস্থা, পারস্পরিক লেন-দেন, নৈতিকতা প্রভৃতি পর্যায়ের আদর্শ ও আইন-বিধানের কোন একটি সম্পর্কেও কি একথা বলা যায় যে, তা কোন কোন ক্ষেত্রে পালনযোগ্য আর অপরাপর ক্ষেত্রে আদৌ পালনযোগ্য নয়? না, কদাচই নয়।

ইসলাম পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ের যে সব বিধি-বিধান পেশ করেছে—বিয়ে, সন্তান পালন, তালাক, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য, ইয়াতীমদের সামাজিক নিরাপত্তাবিধান, অসীয়ত কার্যকরণ, মানুষের পারস্পরিক মিলমিশ, আমানত সংরক্ষণ, সকলের প্রতি উত্তম ব্যবহার প্রদর্শন, ন্যায় কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং অন্যায় ও পাপ কাজে অসহযোগিতা পর্যায়ের আইন বিধান—এর মধ্যে কোনটি এমন, যা পৃথিবীর সকল দেশে, সকল অঞ্চলে ও সকল সমাজে পালন করা যায় না?

ইসলামের নৈতিক আদর্শ ও তৎসংক্রান্ত বিধি-বিধান দ্বীন-ইসলামের গৌরবের বিষয়। তার বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল নৈতিক বিধানকে অতিক্রম করে গেছে। ইসলাম সত্য ভাষণ ও সততার নীতি, আমানত রক্ষার নীতি, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা প্রদর্শন, পরস্পরের প্রতি ভালো ধারণা পোষণ, ক্ষমাশীলতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, মেহমানদারী, ঔদার্য, বিনয়, শোকর, তাওয়াক্কুল, কর্মে নিষ্ঠা প্রভৃতি নৈতিক ভাবধারাসম্পন্ন আদর্শ উপস্থাপন করেছে। পক্ষান্তরে মিথ্যা কথন, কার্পণ্য, বিশ্বাসঘাতকতা, আত্মসাতকরণ, শঠতা, কপটতা, মিথ্যা দোষারোপ, ক্রোধ-আক্রোশ, হিংসা-দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, ধোঁকা-প্রতারণা, অহংকার প্রভৃতি হীন ও জঘন্য কার্যকলাপ পরিহার করার উপদেশ দিয়েছে।

ইসলাম এক অপূর্ব রাজনৈতিক দর্শন ও ব্যবস্থা পেশ করেছে, যাতে সার্বভৌমত্ব ও আইন রচনার মৌলিক ও নিরংকুশ অধিকার কেবলমাত্র সারে জাহানের স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ্‌র জন্য সংরক্ষিত। মানুষ তা গ্রহণ করে তারই মত অন্য মানুষের গোলামী করার ঘৃণ্য লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পেতে পারে। ইসলাম যুদ্ধনীতির সংস্কার করেছে। যুদ্ধের কারণসমূহ বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। জাতীয় সম্পদের অপচয় বন্ধ করেছে। তাতে জনগণের ন্যায্য ও অভিন্ন অধিকার স্বীকার করেছে, ব্যবসা-বাণিজ্য হালাল ঘোষণা করেছে, সুদ ও সর্বপ্রকারের শোষণ হারাম করেছে। এসব ক্ষেত্রে কি কোন গোত্রীয় বা আঞ্চলিকতার গন্ধ পাওয়া যায়? এ পর্যায়ে কুরআনুল হাকীমের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিবেচনা করে দেখা যাক ঃ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ –

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সুবিচার, ইনসাফ, অনুগ্রহ ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং অন্যায়, পাপ, নির্লজ্জতা ও জুলুম-অত্যাচার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি তোমাদেরকে এসব উপদেশ দিচ্ছেন শুধু এই আশায় যে, তোমরা তা গ্রহণ করবে। (আন্-নাহল ঃ ৯০)

কুরআনের এই বিধানসমূহ কি সাধারণভাবে সর্বজনগ্রাহ্য নয়? নয় কি তা সকল মানুষের জন্য সাধারণভাবেই পরম কল্যাণের ধারক? এ ব্যাপারে কি দেশ, উপমহাদেশ আর মহাদেশজনিত কোন ভৌগলিক পার্থক্য ও তারতম্যের একবিন্দু প্রভাব আছে?

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا لا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ –

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ সে সবের প্রকৃত পাওনাদার মালিক বা সেসব পাওয়ার উপযুক্তদের নিকট পৌঁছিয়ে দাও। আর তোমরা যখন লোকদের পরস্পরের মধ্যে কোন ফায়সালা করবে—রায় বা হুকুম দিবে—তখন তোমরা অবশ্যই ন্যায়পরতা ও ইনসাফের সাথে ফায়সালা করবে। (আন্-নিসা ঃ ৫৮)

কুরআন প্রদত্ত ন্যায়পরতার ও সুবিচারের নির্দেশ ছিল একান্তভাবে নৈর্ব্যক্তিক, সর্বতোভাবে নিরপেক্ষ এবং তা এমন প্রেক্ষিতে দেয়া হয়েছিল যখন প্রভাবশালী ইয়াহুদী সমাজ এই পক্ষপাতদুষ্ট নীতির ওপর অবিচল ছিল যে, আরবের উম্মী জনগণ তথা মুসলমান এবং অ-ইয়াহুদী লোকদের প্রতি ন্যায়বিচারের কোন বাধ্যবাধকতাই তাদের ওপরে নেই; তা কেবল ইয়াহুদীদের প্রতিই করণীয়, অন্যদের প্রতি নয়। তাদের এইরূপ নীতি গ্রহণের মূলীভূত কারণ এই ছিল যে, তাদের ধারণা ছিল তাদের ধর্ম গোত্র-ভিত্তিক অর্থাৎ কেবল তাদেরই জন্য। অন্য কারোর কোন অধিকার নেই তাতে। কিন্তু ইসলাম সর্বজনীন দ্বীন। নির্বিশেষে সকল মানুষের পক্ষে অনুসরণীয় ও প্রয়োগযোগ্য বিধানই ইসলাম দিয়েছে। মুসলিম ও অমুসলিমের ব্যাপারে তাতে কোন পার্থক্যই বরদাশ্ত করা হয়নি।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ –

তোমাদের মধ্য থেকে একটি জনগোষ্ঠী অবশ্যই এমন বের হয়ে আসতে হবে, যারা সার্বিক কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাতে থাকবে, আদেশ দিতে থাকবে ন্যায়ের এবং নিষেধ করতে থাকবে সকল অন্যায় কাজ থেকে। (আলে-ইমরান ঃ ১০৪)

কেবলমাত্র নমুনা স্বরূপ এই ক'টি আয়াত এখানে উদ্ধৃত করা হল, যদিও বিষয়টি শুধু এই ক'টি আয়াতের মধ্যেই সীমিত নয়। মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ক্ষেত্রে অনুসরণীয় আরও অনেক উন্নত মানের নৈতিক বিধান উপস্থাপন করেছে কুরআন। সেই সবগুলিকে তো আর এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়।

ইতিবাচকভাবে কেবল ভালো ভালো চরিত্রের কথাই নয়, চরিত্রের খারাপ দিকগুলিকেও কুরআনুল করীম তুলে ধরেছে এবং তা পরিহার করে চলতে নির্দেশ দিয়েছে এই জন্য যে, তা করলে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কারণ ঘটে এবং স্বয়ং ব্যক্তি ও সমষ্টিরও ঘটে নৈতিক পতন ও বিপর্যয়। আর এই উভয় ধরনের আদেশ-উপদেশ পালন করে কেবল মুসলমানরাই উপকৃত হয়নি, অমুসলিমগণও তার সাধারণ কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকেনি। অতএব ইসলাম যদি আঞ্চলিক ধর্ম বা জীবন বিধান হত কিংবা হত বিশেষ সময়-কাল ও শতাব্দীর জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট, তাহলে তদ্দারা সকল দেশের, সকল সময়ের, সকল মানুষের কল্যাণ সাধন করা সম্ভবপর হত না।

মানব প্রকৃতির প্রতি ইসলামের দাওয়াত

ইসলামের যাবতীয় হুকুম-আহকাম এবং ইল্‌ম ও আমল সংক্রান্ত যাবতীয় বিধি-বিধান মানব প্রকৃতির ভিত্তিতে রচিত। সে প্রকৃতিতে সকল দেশের ও সকল কালের মানুষই সর্বতোভাবে সমান। তওহীদী আকীদা, ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব, গণঅধিকারের স্বীকৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক বিস্তৃতি, সকল হীনতা-নীচতা ও জঘন্য কার্যাদি পরিহার, হিংস্রতা, লালসা, জিঘাংসা, পুরাতনের নির্বিচার অনুসরণ, মিথ্যাচার, কুসংস্কার, বৈরাগ্যবাদ ও গার্হস্থ্য জীবন পরিহার—প্রভৃতি পর্যায়ের শত-সহস্র নিষেধস-ূচক বিধি-বিধান সর্ব মানুষের জন্য প্রভূত কল্যাণ উদ্ভাবক। তা সবই নির্বিশেষে সকল মানুষেরই স্বভাব-প্রকৃতির চাহিদা বা দাবি।

সমস্ত মানুষের প্রকৃতি এক, তার দাবিও অভিন্ন আর ইসলামের বিধান তারই প্রেক্ষিতে—তার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করেই রচিত। ফলে তা বিশেষ কোন জাতি বা লোক-সমষ্টির জন্য কল্যাণবহ হবে এবং অন্যদের জন্য হবে ক্ষতিকর এমনটা কখনই হতে পারে না। একথাও বলা সঙ্গত হতে পারে না যে, ইসলামের বিধান কুরআন ও সুন্নাতের সীমিত পরিবেষ্টনীতে আবদ্ধ আর মানবীয় সমস্যা পরিবর্তনশীল, নিত্য নবসংঘটিত ও উদ্ভূত; ফলে ইসলাম মানবীয় সমস্যার সমাধান দিতে পারে না—পারলেও এক অঞ্চলে বা এক সময়ে পেরেছিল, অন্য অঞ্চলে বা অন্য সময় তা পারে না। ইসলামের সর্বজনীন ও সর্বকালীন বিশেষত্ব সম্পর্কে যাদের একবিন্দু ধারণা নেই, কেবল সেই লোকদের মনেই এ ধরনের কথা বাসা বাঁধতে পারে কিংবা যারা এককালে ইসলামের মহাকল্যাণ ও অবদানের কথা স্বীকার করে মুসলিম যুবকদের নতুন ও ভিন্নতর কোন মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তারাই এ ধরনের কথা বলতে পারে। প্রকারান্তরে এটাও ইসলামের সাথে এক মহাশত্রুতা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা সাধারণভাবেই প্রশ্ন তোলা যায়, ইসলাম যদি অতীতের কোন এক সমাজে বা এককালে মানবতার কোন কল্যাণ সাধন করেই থাকে, তাহলে বর্তমানেও দুনিয়ার সকল দেশে সেই ইসলামই কেন প্রযোজ্য বা অনুসরণযোগ্য হবে না, কেন কল্যাণ করতে পারবে না? দ্বীন-ইসলামে যেমন কোন পরিবর্তন হয়নি, তেমনি একবিন্দু পার্থক্য তো দেখা দেয়নি বিশ্ব-প্রকৃতিতে ও মানুষের মৌলিক স্বভাবে?

ইসলাম প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিপন্থী

এ পর্যন্তকার আলোচনা থেকে একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলাম এক বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন দ্বীন। সকল প্রকারের ভৌগোলিক আঞ্চলিকতা ও সময়-কালের সীমাবদ্ধতার সমস্ত বেড়াজালকে তা ছিন্ন-ভিন্ন ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে।

গোত্র, বর্ণ, বংশ বা জাতি প্রভৃতি যাবতীয় সংকীর্ণতাকে ইসলাম পূর্ণ সাফল্যের সাথে এড়িয়ে গেছে। কোনরূপ বস্তুগত বা কালগত পার্থক্যকেই ইসলাম স্বীকার

করেনি। তবে সে মানুষে মানুষে পার্থক্যের একটি মাত্র ভিত্তিকে স্বীকার করেছে আর তা হচ্ছে তাক্ওয়া—আল্লাহ্কে ভয় করে চলার পবিত্র ভাবধারার দিক দিয়ে কে অগ্রসর আর কে পশ্চাদবর্তী। এই একটি মাত্র প্রশ্নে যে অগ্রসর তাকে ইসলাম অগ্রাধিকার দিয়েছে; যে তা নয়, তাকে অগ্রাধিকার দিতেও সে রাজী হয় নি।

মানুষে মানুষে পার্থক্যের এই ভিত্তি পুরাপুরি গুণগত ব্যাপার। এ গুণটিও কারোর পক্ষে অর্জনীয়, কারো পক্ষে নয়, এমন নয়; বরং নির্বিশেষে সকল মানুষই এ গুণটি নিজের মধ্যে অর্জন করতে পারে এবং পারে এ গুণের বলে অধিক মর্যাদাবান হতে।

এ পর্যায়ে কুরআন মজীদের উদাত্ত ঘোষণা হচ্ছে ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ -

হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি শুধু এ উদ্দেশ্যে যে, এর মাধ্যমে তোমরা পারস্পরিক পরিচিত লাভ করবে। তবে তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানার্হ সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক তাক্ওয়াধারী। (আল-হুজরাত ঃ ১৩)

এ আয়াত দুনিয়ার সকল প্রকার বংশ-গোত্র বা জাতিভিত্তিক হিংসাদ্বেষ ও আত্মম্ভরিতাকে ভেঙে ফেলেছে। বিশ্বমানবতার প্রতি এটা ইসলামেরই অবদান। এর পূর্বে অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদই এই উদার মানবিকতার আদর্শ পেশ করতে বা গ্রহণ করতে পারেনি। ইসলামের পক্ষে তা পেশ করা সম্ভব হয়েছে তার তওহীদী আকীদার কারণেই। এ আকীদা অনুযায়ী বিশ্বস্রষ্টা যেমন এক আল্লাহ, তেমনি বিশ্বমানবতাও একই পিতা-মাতা থেকে উৎসারিত, সর্বতোভাবে অভিন্ন। সকল মানুষ একই পিতা-মাতার সন্তান, সকলের দেহে একই পিতা-মাতার রক্ত। এ পর্যায়ে স্বয়ং রাসূলে করীম (স)-এর ঘোষণাবলীও অত্যন্ত উদাত্ত ও বলিষ্ঠ। এখানে তার কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ

اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ اَذْهَبَ عَنْكُمْ نُخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَفَاخُرَهَا اَلَا اِنَّكُمْ مِنْ اٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ طِيْنٍ اَلَّا اِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللّٰهِ عَبْدُ اَتْقَاهُ

হে মানুষ! আল্লাহ্ তোমাদের থেকে জাহিলিয়াতের যাবতীয় আত্মম্ভরিতা ও তা নিয়ে গৌরব-অহংকার দূর করে দিয়েছেন। তোমরা সকলেই আদম সন্তান এবং আদম মাটি থেকেই সৃষ্ট। তবে আল্লাহ্র বান্দাহগণের মধ্যে সব চেয়ে ভালো সেই বান্দাহ যে তাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু।

اَلَا اِنَّ الْعَرَبِيَّةَ لَيْسَتْ بَابُ وَالِدٍ وَلٰكِنَّهَا لِسَانٌ نَاطِقٌ فَمَنْ قَصُرَ عَمَلُهُ لَمْ يَبْلُغْ بِهٖ حَسَبُهٗ-

জেনে রাখ, আরব হওয়াটা কোন পিতার দ্বারপথ নয়, তা কথা বলার বিশেষ একটা ভাষা মাত্র। তাই যার আমল অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ, তার অংশ এবং বংশীয় মর্যাদা তা পূরণ করতে অক্ষম।

اِنَّ النَّاسَ مِنْ عَهْدِ اٰدَمَ اِلٰى يَوْمِنَا هٰذَا مِثْلُ اَسْنَانِ الْمَشْطِ لَافَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰى عَجَمِيٍّ وَلَا لِاَحْمَرَ عَلٰى اَسْوَدِ اِلَّا بِالتَّقْوٰى

সমস্ত মানুষ আদমের সময় থেকে এই দিন পর্যন্ত চিরুনীর কাঁটাসমূহের মত সমান। আরবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই অনারবের ওপর, গৌর বর্ণের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই কৃষ্ণাঙ্গের ওপর—কেবল তাকওয়ার দিক দিয়েই পার্থক্য হতে পারে।

اِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ كَرِيْمٌ عَلَى اللّٰهِ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللّٰهِ -

মানুষ চরিত্রের দিক দিয়ে দুই পর্যায়ে বিভক্ত। এক পর্যায়ের মানুষ ঈমানদার, আল্লাহ্‌ভীরু—আল্লাহ্‌র নিকট সম্মানার্হ। আর এক পর্যায়ের মানুষ পাপাচারী নাফরমান, দুশ্চরিত্র এবং আল্লাহ্‌র নিকট একেবারেই সম্মানহীন।

ইসলামের সর্বজনীনতা ও সর্বকালীনতা প্রমাণকারী উপরোদ্ধৃত অকাট্য দলীল-প্রমাণ সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের ইসলাম-দুশমন প্রাচ্যবিদ (Orientalist) স্যার উইলিয়াম মূর বলতে দ্বিধা করেন নি যে, 'ইসলামের বিশ্বজনীনতার ধারণা পরবর্তী কালে সৃষ্ট।' এ পর্যায়ের বহু সংখ্যক আয়াত ও হাদীস বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তিনি বলেছেন ঃ 'এমনকি মুহাম্মাদ (স)ও নিজ সম্পর্কে তা চিন্তা করেন নি। তিনি চিন্তা করেছিলেন, একথা মেনে নিলেও তাঁর চিন্তা ছিল প্রচ্ছন্ন। আসলে তাঁর চিন্তার জগত ছিল শুধু আরবদেশ। তার উপস্থাপিত দ্বীন কেবল আরবদের জন্যই রচিত। আর মুহাম্মাদ তাঁর দাওয়াত নবুয়্যাত লাভের সময় থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কেবল আরবদের সম্মুখেই পেশ করেছেন, অন্য কারোর জন্য নয়'।

স্পষ্টত মনে হচ্ছে, উইলিয়াম মূর নিতান্ত অন্ধ বলেই ইসলামের বিশ্বজনীনতা দেখতে পাননি, তার দৃষ্টি সংকীর্ণতা ও দৃষ্টিভ্রমই এর একমাত্র কারণ।

মনে হচ্ছে তিনি একজন ইতিহাসবিদ হয়েও তদানীন্তন আরবের বিশ্ব-বাণিজ্য পরিক্রমা সম্পর্কে কিছুমাত্র অবহিত ছিলেন না। হযরত মুহাম্মাদ (স) আরবের বাইরের দেশসমূহ সম্পর্কে জানতেন না, নবুয়্যাত লাভ করার পরও তিনি সমগ্র দৃষ্টি কেবল আরবদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ দেখেছেন—এ ধরনের কথা ইতিহাসের দৃষ্টিতেই সম্পূর্ণ

ভিত্তিহীন। কে না-জানে, তিনি নবুয়্যাত লাভের পূর্বেও আরব উপদ্বীপের বাইরে ব্যবসা উপলক্ষে যাতায়াত করেছেন? তা সত্ত্বেও একথা কি বলা যেতে পারে যে, তিনি আরব দেশ ছাড়া অন্য কোন দেশ সম্পর্কে জানতেন না? অথচ তাঁর দ্বীনী দাওয়াতের প্রথম পর্যায়েই তাঁর প্রতি ঈমান গ্রহণ করেছিলেন হাবশার বেলাল, রোমের সুহাইব এবং পারস্যের সালমান। এসব দেশ তো আরবের বাইরে অবস্থিত; তাছাড়া কুরআনের বাণীই তাঁকে ও তাঁর দাওয়াতকে বিশ্বজনীন ও সর্বজজীন বানিয়েছে—বানিয়েছে সর্বকালীন। কেননা কুরআন দাবি করছে ঃ

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ -

হে নবী! তোমার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি, তা সবকিছুর ভাষ্যকার, মুসলিমদের জন্য হেদায়েত, রহমত ও সুসংবাদ। (আন্-নাহ্ল ঃ ৮৯)

এই 'মুসলিম' দুনিয়ার যে কোন মানুষই হতে পারে—হতে পারে ইসলাম কবুল করলেই। প্রথম পর্যায়েই মুহাম্মাদ (স) প্রচারিত দ্বীন সর্বজনীন ও সর্বজাতীয় তথা আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করেছিল। সেই পর্যায়ের ইতিহাসই তা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে।

রাসূল জীবনের আকর্ষণীয় দিক

আমার নিকট রাসূলে করীম (স)-এর সবচাইতে আকর্ষণীয় দিক কোন্‌টি—এ পর্যায়ে একটি নিবন্ধ লিখবার জন্য আমাকে বলা হয়েছে। কিন্তু আমার নিকট সেই মহান ব্যক্তির সুমহান জীবনের কোন্‌ দিকটি কম আকর্ষণীয় যে, আমি তা থেকে বেশী আকর্ষণীয় দিককে আলাদাভাবে চিহ্নিত করব? এ প্রশ্নের জবাব দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা আমি যখনই রাসূলে করীম (স)-এর সুমহান জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখনই এক কূল-কিনারাহীন মহাসমুদ্রের দৃশ্য আমার সম্মুখে অত্যুজ্জ্বল হয়ে ভেসে ওঠে। সেই মহাসমুদ্রের কোন অংশকে তার অন্য অংশ থেকে পৃথক করে দেখা আমার পক্ষে সত্যই অসম্ভব। যদি প্রশ্ন করা হয়, সূর্যের কোন্‌ দিকটি বেশী ভাল লাগে—তার উত্তাপ বিকিরণ, না তার আলো বিচ্ছুরণ—গোটা বিশ্বলোক থেকে অন্ধকার দূর করে তাকে আলোকোজ্জ্বল করে তোলা?—তাহলে এর সুস্পষ্ট ও অকাট্য জবাব দেয়াও হয়ত অনেকের পক্ষেই সহজ হবে না। আলোচ্য প্রশ্নটি কি সেই পর্যায়ের নয়?

রাসূলে করীম (স) একজন মানুষ ছিলেন আর সেই সাথে ছিলেন বিশ্বমানবের জন্য আল্লাহ্‌র মনোনীত সর্বশেষ রাসূল। নিছক মানুষ হিসেবে তাঁর সম্পর্কে যখনই ভাবি—এক তুলনাহীন, দৃষ্টান্তহীন মহান ব্যক্তিত্বের দেদীপ্যমান ছবি আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। স্পষ্টত মনে হয়—তিনি মানুষ ছিলেন বটে, কিন্তু সেই মানুষ থেকেই যেন তিনি সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম। তাঁকে আগের ও পরের সব মানুষের সাথে একাকার করে দেখা তো অত্যন্ত কঠিন। সেই মানুষের বাল্যকাল ছিল, ছিল কৈশোর, যৌবন ও পূর্ণ বয়স্কতার কালও। কিন্তু এর যে কোন একটি কালের মুহাম্মাদ (স) সেই কালের অন্য সব মানুষ থেকেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিতে শুভ্র সমুজ্জ্বল। কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ কালে বয়স্কদের সাথে বালকেরাও মাথায় করে প্রস্তরখণ্ড বহন করছে। বালক মুহাম্মাদ (স) তাদের মধ্যে শামিল। কিন্তু তিনি তাদের সাথে একাকার হয়ে যাননি। সকলেরই পরিধেয় বস্ত্র শিরস্ত্রাণে পরিণত; কিন্তু বালক মুহাম্মাদের মাথার চুলই পাগড়ীর কাজ করছে, দিগম্বর হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। আর একবার কা'বা পুনঃনির্মাণকালে 'হাজরে আসওয়াদ'—কালো পাথর যথাস্থানে সংস্থাপন নিয়ে কুরাইশের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-সংঘাত-বিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত সর্বসম্মতভাবে সাব্যস্ত হল, পরদিন মসজিদুল হারামের দ্বারপথে সর্বপ্রথম যে লোকটি প্রবেশ করবে, সে-ই বিবাদীয় বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেবে। যথাসময়ে দেখা গেল, দ্বারপথে প্রথম প্রবেশকারী লোকটি মুহাম্মাদ (স), অন্য কেউ নয়। সকলেই

সন্তুষ্টচিত্তে তাঁকে মীমাংসাকারী রূপে মেনে নিল। আর তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে এই গৌরবজনক কাজে সকল গোত্রের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ করে দিয়ে দাউ করে দাউ করে জ্বলে ওঠা গোত্রীয় যুদ্ধের আগুনে যেন এক সাগর পানি ঢেলে দিলেন। এটা কি কোন অংশে কম বিস্ময়কর ব্যাপার?

মক্কার ব্যবসা কেন্দ্রে জনৈক ব্যবসায়ীর নিকট থেকে পণ্য গ্রহণ করে তাকে তার মূল্য না দিয়ে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল জনৈক প্রবল প্রতাপান্বিত কুরাইশ সরদার। তার এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ী ফরিয়াদ করেও মক্কাবাসীদের নিকট থেকে কোন প্রতিকার পাওয়া থেকে বঞ্চিতই থেকে গেল। এই জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠা যুব সম্প্রদায়কে সুসংবদ্ধ করে সকল প্রকার জুলুমের প্রতিকারে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন যে যুবক, তিনি কি কারোর নিকট কম শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারেন?

পঁচিশ বছর বয়সের উচ্ছল যৌবনদীপ্ত যে ব্যক্তিটি প্রায় বিগত-যৌবনা এক বিধবা মহিলাকে সারাজীবনের তরে জীবন-সঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করে দাম্পত্য জীবনের পরম তৃপ্তি নিয়ে পরিপূর্ণ কর্মজীবনের দিকে অগ্রসর হতে পারেন, হৃদয়-নিঙড়ানো ভক্তি শ্রদ্ধা যে তাঁর উদ্দেশ্যেই উৎসর্গিত হবে, তা কে ঠেকাতে পারে?

মানুষ মুহাম্মাদ (স)-এর উন্নত জীবনে এই উচ্চশির পর্বততুল্য কীর্তিমালা দেখে কোন্ নির্বোধের হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত না হয়ে পারে, বলতে পারেন?

চতুর্দিক নিঃসীম ও নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে নিমজ্জিত। একবিন্দু আলোক-রশ্মি লক্ষ্যগোচর হচ্ছে না কোন দিকেই। মানবতা সেই নিবিড় অন্ধকারের গভীর তলদেশে নিমজ্জিত। অজ্ঞানতা, পাশবিকতা ও অমানুষিকতা অক্টোপাশের মত পরিবেষ্টন করে আছে সমস্ত মানবতাকে। মানুষ চেনে না নিজেকে, বুঝে না নিজের দায়িত্ব কর্তব্য; জানে না এই বিশ্বলোকের একজন মহান স্রষ্টা রয়েছেন এবং তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে আছে সৃষ্টিলোকের প্রতিটি অণু-পরমাণু। আর তাঁর প্রতিও যে মানুষের কর্তব্য আছে, সে বিষয়ে গোটা মানবতা সম্পূর্ণ চেতনাহীন; জানে না মানুষের এই মহাযাত্রা কেন, কি মানুষের জীবন-লক্ষ্য; বরং নিত্যদিন মানুষ অমানুষিক কার্যকলাপে এমনভাবে মশগুল যে, মানুষ ও পশুতে কোন তফাতই থাকেনি। নগ্নতা-নির্লজ্জতা, হিংস্রতা-পাশবিকতা, দুষ্কৃতি-অনাচার, দস্যুতা-লুটতরাজ, মারামারি–রক্তপাত—সবকিছুই সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মানুষের এই মর্মান্তিক দুরবস্থা দেখে যে দয়ার্দ্র-হৃদয় কান্নায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল মানবতার মুক্তির চিন্তায়, একান্ত কাতর হয়ে পড়া সেই মহান ব্যক্তিটি ক্রমাগত কয়েকটি দিন ও রাত্রি 'নূর পর্বতে'র শৃঙ্গোপরি নির্জন-নিস্তব্ধ-নিথর হেরা গুহায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কাল যাপনের পর যখন মানুষ সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটক, জ্ঞান-উৎসের দিগদর্শন ও কর্তব্য নির্ধারক মহাবাণীর অংশ নিয়ে লোকালয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন যে তিনি বিশ্বমানবতার জীবনে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে দিলেন, স্তব্ধ হয়ে যাওয়া

মহাযাত্রায় এক নতুন চালিকা শাক্তির সংযোজন করলেন, ধরণী ধূলার মানুষের সাথে অলৌকিক জগতের সংযোগ স্থাপন করলেন, মানুষকে শোনালেন আশার বাণী ও মুক্তির আহ্বান, তার পরিপ্রেক্ষিতে সেই মহান ব্যক্তিত্বকে বিশ্বমাবতার অবিসংবাদিত মুক্তিদূত রূপে চিহ্নিত করা ছাড়া সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কোনই উপায় থাকতে পারে কি?

অতপর সুদীর্ঘ তেইশটি বছর ধরে ক্রমাগতভাবে তিনি বিশ্বস্রষ্টার নিকট থেকে মানুষের জন্য এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান গ্রহণ করলেন, তা তিনি লোকদের মাঝে মুখে মুখে প্রচার করলেন এবং বাস্তবে তাকে সুষ্ঠুরূপে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম শুরু করে দিলেন। এই সংগ্রাম যে কতখানি কঠিন ও প্রাণান্তকর ছিল, এজন্য তাঁকে কত নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে, প্রস্তরাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত সমগ্র শরীর থেকে রক্তের ধারা প্রবাহিত হয়ে তাকে ক্লান্ত-অবসন্ন করে দিয়েছিল, অর মর্মস্পর্শী ইতিহাস চিরকাল অম্লান হয়ে থাকবে। তিনি ইচ্ছা করলে স্ত্রীর প্রদত্ত বিপুল বৈভবে বিলাস-ব্যসনের সুখ-সাগরে ডুব দিয়ে মহা আরামে দিনাতিপাত করতে পারতেন। কিন্তু না, তিনি সুখ চান নি, নিশ্চিত-নিষ্ক্রিয় জীবন কাটাবার জন্যও তিনি দুনিয়ায় আসেন নি। তিনি যে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন, তাতেই ব্যয় হয়ে গেল সব সম্পদ; এমন কি এমন এক সময়ও উপস্থিত হল, যখন দ্বীনী দাওয়াতের কাজে দূরবর্তী স্থানে গমনের জন্য দ্রুতগামী কোন জন্তুযানও সংগ্রহ করা সম্ভবপর হল না তাঁর পক্ষে।

আল্লাহ্র নির্দেশে তিনি যখন প্রকাশ্যভাবে দ্বীনী দাওয়াতের সূচনা করার উদ্দেশ্যে 'সাফা' পর্বতের শীর্ষে উঠে মক্কাবাসীকে আহবান জানালেন, তখনও চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী তিনি নগ্নতাকে গ্রহণ করলেন না। তিনি শিখরদেশে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন গোত্রের নাম উল্লেখ করে সমবেত লোকদেরকে ডেকে বললেন ঃ "আমি যদি বলি, পাহাড়ের ওপাশে এক দুর্ধর্ষ শত্রুবাহিনী সমবেত হয়েছে, তোমাদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তাহলে তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে?"

সমবেত জনতা আহবানকারীকে দেখল, চিনল, স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীকার করল—এ তো চিরপরিচিত, সততা-সত্যবাদিতা-বিশ্বস্ততা-ন্যায়পরতা ও কল্যাণ-কামনার দিক দিয়ে সুপরীক্ষিত আস্থাভাজন ব্যক্তি। এঁর মুখে কোন দিনই এক বিন্দু মিথ্যা উচ্চারিত হয়নি। ধোঁকা-প্রতারণার কোন দোষই তাঁকে কখনও স্পর্শ করেনি। পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে তারা পাহাড়ের অপরদিকে দৃষ্টিপাত করতে পারছে না। কিন্তু পর্বতশিখরে দাঁড়িয়ে থাকার দরুন তিনি উভয় দিক সমানভাবেই দেখতে পাচ্ছেন। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ

আমি তোমাদেরকে সম্মুখবর্তী কঠিন আযাবের জন্য সতর্ক করে দিচ্ছি। এই ঘোষণার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া যা-ই হোক, কিন্তু যে স্থানে দাঁড়িয়ে তিনি এই মহা সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেন, আল্লাহ্র রাসূল হিসেবে তা-ই ছিল তাঁর যথার্থ স্থান ও

মর্যাদা। তিনি ছিলেন পৃথিবী ও মহাকাশের সংযোগ বিন্দু। আল্লাহ্‌র বিধান মানুষের নিকট পৌঁছাবার তিনিই ছিলেন একমাত্র মাধ্যম। ইহকালের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে অদৃশ্য মহাপরকাল প্রত্যক্ষ করার জন্য তিনি হচ্ছেন এক স্বচ্ছ উজ্জ্বল দর্পণ। দ্বীনী দাওয়াত প্রচারের ইতিহাসে এ এক বিরল ঘটনা। এর দৃষ্টান্ত কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে কি? তিনিই মানুষকে জানিয়েছেন এই পার্থিব জীবনের নশ্বরতা ও পরকালীন জীবনের অবিনশ্বরতা। তিনিই শুনিয়েছেন এই মহাসত্য যে, পরকালীন জীবনের শান্তি-সুখ ও নিরাপত্তা ইহকালীন জীবনের চেষ্টা-সাধনা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার অনিবার্য ফসল।

বিশ্বনবীর তওহীদী দাওয়াতের প্রত্যক্ষ আঘাত পড়েছিল আবহমান কাল থেকে চলে আসা মূর্তিপূজা, দেব-দেবীর প্রাধান্য, সরদার-পুরোহিতদের আধিপত্য, পুঁজিপতিদের শোষণ-নির্যাতন ও কর্তৃত্বের ওপর। তাই বিষধর অজগরের ন্যায় তারা সকলেই হিংস্রতার ফণা তুলে দাঁড়িয়ে গেল। চাচা আবূ তালিবের ওপর সামজিক চাপ প্রয়োগ করে তাঁকে তাঁর এই কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টায়ও যখন তারা ব্যর্থ হল, তখন তারা নানা লোভনীয় প্রস্তাব দিয়ে লোভ-লালসা-উত্তীর্ণ এই মহান মানুষটিকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে চাইল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলে উঠলেন :

> ওরা যদি আমার এক হাতে সূর্য আর অন্য হাতে চাঁদকেও তুলে দেয়, তবু আমার এই মানব-মুক্তির অভিযান চলতেই থাকবে, যতক্ষণ না আল্লাহ্ একে সাফল্যমণ্ডিত করেন কিংবা আমিই শেষ হয়ে যাই।

কত বড় ঈমানী দৃঢ়তা ও সংকল্পের অনমনীয়তা থাকলে এরূপ শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায়ও মানুষের নিকট চিরকাম্য প্রস্তাবের জবাবে কেউ এরূপ কথা বলতে পারে? এর দৃষ্টান্ত কোন্ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খুঁজে পাওয়া সম্ভব, বলুন তো?

কুরাইশ সরদার উত্‌বা এসেছিল প্রতিনিধি হিসেবে আপোষ-মীমাংসার কথা বলতে। বলল : হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমার তওহীদী দাওয়াতে শিরক্-এর মস্তক ধূলায় লুণ্ঠিত হচ্ছে; মুশরিক সমাজে ব্যাপক ভাঙন ও ফাটল দেখা দিয়েছে, সরদারগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়, এক মহাসংকট সমাজ-ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছে; তুমি যদি তোমার এ অভিযানকে থামাতে রাজী হও, তাহলে তুমি যা চাইবে তা-ই তোমার হাতে তুলে দেব। যদি ধন-সম্পদের প্রয়োজন হয়ে থাকে তাহলে বল, আমাদের সমস্ত বিত্ত-সম্পদ তোমার পদমূলে স্তূপীকৃত করে দেব। তুমি হবে শ্রেষ্ঠ ধনী ও বিত্তশালী। যদি মর্যাদার অভিলাষী হয়ে থাক, বল, তোমাকেই আমরা মহাসম্মানার্হ সরদার মেনে নেব। যদি তোমার বাদশাহ্ হওয়ার খায়েশ জন্মে থাকে, বল, আমাদের একমাত্র বাদশাহ্ হবে তুমি। আর এটা যদি তোমার কোন রোগের উপসর্গ হয়ে থাকে, বল, সেরা চিকিৎসক এনে তোমাকে আমরা সুস্থ ও নিরাময় করে তুলব।

প্রচণ্ড কম্পনে পর্বত শৃঙ্গও তো ভেঙে পড়ে। কিন্তু উত্‌বার প্রস্তাবে পর্বতের চাইতেও অধিক ধৈর্যশীল ব্যক্তি একটু কেঁপেও উঠলেন না। এই অপমানকর প্রস্তাবগুলি তিনি সহজেই হজম করতে পারলেন।

তুলনাহীন ধৈর্য রক্ষা করে পর্বতের ন্যায় মাথা উঁচু করে নীরব-নির্বাক হয়ে থাকলেন ধৈর্য-সহ্যের দীক্ষাগুরু এই মহান মানুষটি। নিতান্তই অর্থহীন কথা বলবার সুযোগ দিলেন উত্‌বাকে উদার নির্বিকার হয়ে বসে থেকে। অতপর বললেন ঃ আপনার সব কথা বলা হয়ে থাকলে এক্ষণে আমার বক্তব্য শুনতে থাকুন। এই বলে তিনি জলদগম্ভীর কণ্ঠে আল্লাহ্‌র কালাম পাঠ করতে শুরু করলেন।

আল্লাহ্‌র এ কালাম পর্বতের সু-উচ্চ শিখর থেকে সদা প্রবহমান ঝর্ণাধারার মত রাসূলে করীম (স)-এর কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়তে লাগল। আবুল অলীদ উত্‌বা নীরব নির্বাক হয়ে শুনতে লাগল। কুরআন পাঠ শেষ হলে নবী করীম (স) মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে মস্তক মাটিতে লুটিয়ে দিলেন। উত্‌বাও এই অভূতপূর্ব দৃশ্য অবলোকন করল এবং এক অজানা অচেনা পারিপার্শ্বিকতায় অভিভূত হয়ে থাকল। সে স্পষ্টত মনে করল, আসমান-জমিন একাকার হয়ে গেছে। সৃষ্টিলোকের দুর্জ্ঞেয় রহস্য যেন তার সম্মুখে উদ্ঘাটিত ও দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত। তদানীন্তন উন্নত আরবী সাহিত্যের কোন কিছুই তার অজানা নয়; কিন্তু এ কালাম আরবী হওয়া সত্ত্বেও কোন অলৌকিক জগত থেকে আসা এক অতি-মানবিক কালাম। মানবীয় ভাষা হওয়া সত্ত্বেও তা অতি-মানবীয়। এই কালামের কোন দৃষ্টান্ত সে তার অভিজ্ঞ জীবনের স্মৃতিকোঠায় আঁতিপাতি করেও খুঁজে পেল না। তার বুঝতে একটুও অসুবিধা হল না যে, এ কালাম মুহাম্মাদ (স) রচিত নয়—নয় তা কোন বড় কবি বা সাহিত্যিকেরও। এ কালাম রচনা কেবল তাঁর পক্ষেই সম্ভব, যিনি ভাষার স্রষ্টা, যাঁর নিকট অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সমস্ত জ্ঞান-তত্ত্ব সমানভাবে সমুদ্ভাসিত।

কালাম শোনার পর মনে হল উত্‌বার ওপর দিয়ে যেন এক প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। তার বিরুদ্ধ মনোভাবের সব পুঞ্জীভূত মেঘ যেন প্রচণ্ড হাওয়ায় অপসৃত হয়ে গেছে।

সে যখন অদূরে সমবেত কুরাইশমণ্ডলীর নিকট ফিরে গেল, তারা দূর থেকে দেখেই বুঝাতে পারল—যে উত্‌বা তাদের নিকট থেকে গিয়েছিল, সেই উত্‌বা ফিরে আসেনি। এ যে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত এক ভিন্নতর ব্যক্তি।

সে তাদের সম্বোধন করে কথা বলল। কিন্তু তার কণ্ঠস্বর ও বলার ভঙ্গি ছিল যুদ্ধ-বিধ্বস্ত পরাজিত এক সেনাধ্যক্ষের মত। সে বলল ঃ তোমরা আমার কথা শোন। এই ব্যক্তির পিছনে তোমরা আর লেগে থেকো না; এর সাথে শত্রুতা পরিহার কর। আজ আমি যে কালাম শুনেছি তা কবিতা নয়, জাদুমন্ত্র নয়, তা নয় মানবীয়। লোকেরা বললঃ মুহাম্মাদ তোমায় জাদু করেছে। উত্‌বা বলল ঃ আমি সত্য বলছি। এক্ষণে তোমাদের যা ইচ্ছা করতে পার।

বস্তুত আল্লাহ্র কালামের এই বিজয়ই বিশ্বনবী (স)-এর দ্বীন প্রতিষ্ঠার অগ্রাভিযানে প্রধান শানিত হাতিয়ার। সমস্ত মানুষই এর নিকট পরাজিত হতে বাধ্য। বস্তুত এই খোদায়ী কালাম—কুরআন মজীদই ছিল তাঁর প্রধান অবলম্বন। তিনি নিজেকে পূর্ণ মাত্রায় এই কুরআন অনুযায়ী গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর চিন্তা-বিশ্বাস, তাঁর সার্বিক কার্যাবলী, তাঁর গোটা চরিত্রই গঠিত হয়েছিল আল্লাহ্র নাযিল করা এই কুরআনের ভিত্তিতে। ফলে তিনি কুরআনের সাথে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন। আদর্শ হিসেবে কুরআন যা, বাস্তবতার দৃষ্টিতে তিনি ঠিক তা-ই। তিনি কুরআনেরই বাস্তব প্রতিচ্ছবি। দুনিয়ার ইতিহাসে এরূপ কোন ব্যক্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে কি?

তিনি ছিলেন দুনিয়ার সকল যুগের, সকল দেশের, সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য একমাত্র আদর্শ। মানুষের জন্য যে দিক দিয়ে কোন মহত্তর ও উচ্চতর অনুসরণীয় আদর্শের সন্ধান করা হবে, কেবলমাত্র মুহাম্মাদী চরিত্রেই তার পূর্ণ মাত্রার প্রতিফলন দেখা যাবে। তাঁকে ছাড়া আর কোন ব্যক্তিত্বই এমন পাওয়া যাবে না, যাকে কোন একটি দিক দিয়েও আদর্শ অনুসরণীয় রূপে উপস্থাপন করা সম্ভব। আমার দৃষ্টিতে এ এক মহা বিস্ময়কর ব্যাপার।

মহান আল্লাহ্র ঘোষণা "তোমাদের জন্য অতীব উত্তম অনুসরণীয় আদর্শ আল্লাহ্র এই রাসূলের মধ্যেই বিধৃত" পুরাপুরি সার্থক এবং যথার্থ। এ ব্যাপারে এক বিন্দু ব্যতিক্রম পাওয়া যাবে না কোন একটি দিক দিয়েও। এই সুমহান ও সর্বোন্নত আদর্শ ব্যক্তিত্বকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করলেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ -

আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সমগ্র বিশ্বলোকের জন্য একমাত্র রহমত স্বরূপ।

আর বিশ্বনবীর গোটা জীবন, তাঁর সকল প্রকার কার্যাবলী, বিশেষত তাঁর মাধ্যমে পাওয়া পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান ইসলামের প্রতিটি দিকই তো অফুরন্ত রহমতের বাহন। এর কোন্টিকে অপর কোন্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়? এ যে এক অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন মহাসত্য। এই মহাসত্যের সন্ধান পেয়েই তো আমি ধন্য। তিনিই মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্তি দিয়েছেন—মুক্তি দিয়েছেন সকল প্রকার অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে। সার্বভৌমত্ব ও নিরংকুশ মালিকত্বের সমস্ত অধিকার তিনি মানুষের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে একমাত্র আল্লাহ্তেই সোপর্দ করেছেন আর সমস্ত মানুষকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক—সর্বদিক দিয়ে আল্লাহ্র খলীফার আসনে বসিয়েছেন। এটা যে তাঁর কত বড় অবদান, আমি যতই চিন্তা করি, বিস্ময়রসে আপ্লুত হই, গভীরভাবে মুগ্ধ হই। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠি ঃ নেই, কেউ নেই তাঁর সমতুল্য। সর্বদিক দিয়েই তিনি মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। সেই মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির প্রতি জানাই অন্তরের অফুরন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা—সালাম ও দরূদ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদ।

বিশ্বনবীর সংগ্রামী জীবন

মহত্তর ও বৃহত্তর উদ্দেশ্য লাভের জন্য প্রাণান্তকর সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার রক্তাক্ত কাহিনী মানবেতিহাসের পাতায় পাতায় শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। এই সংগ্রামে মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হয়েছে। সর্বকার নির্যাতন-নিষ্পেষণ অকাতরে সহ্য করা হয়েছে। শত্রুপক্ষকে প্রবল শক্তিতে প্রতিহত করা হয়েছে। কখনও বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে সংগ্রামীকে, কখনও সাময়িকভাবে পরাজয়ও বরণ করে নিতে হয়েছে নির্দ্বিধায়। আবার কখনও বিজয়-মাল্যে ভূষিত ও বরিত হওয়াও সম্ভবপর হয়েছে।

এ পর্যায়ে আল্লাহ্ প্রেরিত নবী-রাসূলগণের জীবন ইতিহাস সর্বাধিক উজ্জ্বল-উদ্ভাসিত। তাঁদের সংগ্রাম কোন ক্ষণভঙ্গুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়নি; নিছক রাষ্ট্রশক্তির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাও ছিল না তাঁদের সংগ্রামের লক্ষ্য। তাঁদের গোটা জীবনই উৎসর্গিত ছিল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে এবং তার একমাত্র উপায় ও বাস্তব পন্থা হিসেবে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন দুনিয়ার বুকে আল্লাহ্র দ্বীন সর্বাত্মকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার অবিশ্রান্ত সাধনাকে। এ উদ্দেশ্যেই তাঁরা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন আর আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছেন। এ পথে প্রতিপক্ষের তরফ থেকে যত দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন-নিষ্পেষণ এসেছে, তা সবই তাঁরা অকাতরে সহ্য করেছেন। এ দৃষ্টিতে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবন অন্যান্য সকলের তুলনায় অধিক ভাস্বর। তাঁর সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে শুরুতেই একটি কথা বলে রাখতে চাই। তা হল, তিনি অন্যায়ের কাছে কখনই মাথা নত করেন নি; শত্রুপক্ষের সংখ্যা-বিপুলতা দেখে তিনি কখনই একবিন্দু ভয় পান নি—ভীত-সন্ত্রস্তও হন নি তিনি কখনো। শত্রুপক্ষ যখনই তাঁকে চ্যালেঞ্জ করেছে, তিনি তার মুকাবিলায় বুক উঁচু করে দাঁড়িয়ে গেছেন।

হযরত মুহাম্মাদ (স) যখন আল্লাহ্র নবী ও রাসূল হিসেবে মনোনীত হলেন, তখন তিনি সমাজের লোকদের নিকট সর্বপ্রথম দাওয়াত দিলেন একমাত্র মহান আল্লাহ্র বন্দেগী কবুল করার। কিন্তু এই দাওয়াতই ছিল তখনকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানবগোষ্ঠী ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী সমাজপতিদের স্বার্থের পরিপন্থী। তারা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল, মানুষ যদি একান্তভাবে আল্লাহ্র বন্দেগী কবুল করে নেয়, তাহলে তাদের ওপর আবহমানকাল থেকে চলে আসা নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তি নিঃশেষ ও নির্মূল হয়ে যাবে। মানুষকে নিজেদের অধীন ও দাস বানিয়ে রাখা আর সম্ভবপর হবে না। বংশানুক্রমে পূজিত দেব-দেবীর পূজা-উপাসনা সহসা বন্ধ হয়ে যাবে; জনগণকে শোষণ করে অর্থ-সম্পদের পাহাড় গড়া অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই তারা মুহাম্মাদ (স)-এর এই

দাওয়াতের সংক্ষিপ্ত বাণী শুনেই কেঁপে উঠেছিল। এ দাওয়াতের আঘাত কত ভয়াবহ, কতখানি সুদূরপ্রসারী, তা সুস্পষ্ট অনুভব করা তাদের পক্ষে সহসাই সম্ভবপর হয়েছিল। শত শত বছর ধরে প্রতিষ্ঠিত জাহিলিয়াতকে কি করে রক্ষা করা যায়, সেজন্য তারা চিন্তায় আকুল হয়ে উঠেছিল এবং সেজন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল।

প্রথমে এই দ্বীনী দাওয়াতের আন্দোলন ও কার্যক্রমকে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাসের ঝড়ো বাতাসের মুখে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা চালায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ দাওয়াতকে ক্রমশ ব্যাপক হতে দেখে তারা অধিক কাতর ও বিহ্বল হয়ে পড়ে এবং নানাভাবে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে এই দাওয়াতী অভিযান স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য চেষ্টা শুরু করে। কিন্তু তাও শেষ পর্যন্ত কোন সফলতা লাভ করতে পারল না। রাসূলে করীম (স) তাঁর দাওয়াতী অভিযানকে কিছুমাত্র শিথিল করতে প্রস্তুত হলেন না, বরং প্রতিপক্ষ যত ভয়-ভীতিই প্রদর্শন করতে লাগল, তিনি তত বলিষ্ঠতা সহকারেই তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে যেতে লাগলেন। কেননা এ দাওয়াত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই তাঁকে নবী-রাসূলরূপে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এ ছিল তাঁর ওপর আল্লাহ্‌র অর্পিত একটা বিরাট দায়িত্ব। মানুষকে মানুষ তথা যাবতীয় অ-খোদার দাসত্ব থেকে মুক্ত করে একমাত্র বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহ্‌র বান্দাহ বানানোই ছিল এই দুনিয়ায় তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য। এই লক্ষ্য থেকে তিনি কখনই একবিন্দু বিচ্যুত হতে পারেন না।

শেষ পর্যন্ত দ্বীন-ইসলাম যখন আরব সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়ে পড়ল, সমাজের লোকদের সজাগ দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হল এবং তারা এ দাওয়াত গ্রহণেই নিজেদের মুক্তির পথ দেখতে পেল, তখন বিরুদ্ধবাদীরা নিজেদের জন্য মহাসংকট মনে করল। এ বিষয়ে চিন্তা-বিবেচনা করে কোন কার্যকর পন্থা উদ্ভাবনের জন্য কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট উপস্থিত হল এবং নিজেদের এই বক্তব্য পেশ করল ঃ

> হে মুহাম্মদ! আমরা তোমার নিকট উপস্থিত হয়েছি এই উদ্দেশ্যে যে, আমরা তোমার সাথে স্পষ্টভাবে কথাবার্তা বলতে চাই। খোদার নামে শপথ করে বলছি, তুমি তোমার জাতিকে যে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন করে দিয়েছ, এমন আর কেউ কখনও করেছে বলে আমাদের জানা নেই। তুমি আমাদের পূর্ব-পুরুষকে গালাগাল দিয়েছ, আমাদের আবহমানকাল থেকে চলে আসা ধর্মবিশ্বাসকে ক্ষুণ্ন ও আহত করেছ। আমাদের পূজ্য-উপাস্য দেব-দেবীর কুৎসা প্রচার করেছ। সমাজের সর্বজনমান্য নেতাদের বোকা ও নির্বোধ বলে অভিহিত করেছ। এভাবে আমাদের আবহমানকালের সুস্থ সুসংবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ সমাজ সংস্থাকে তুমি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছ। এক কথায়, এমন খারাপ ব্যাপার অবশিষ্ট নেই, যা তুমি তোমার ও আমাদের মাঝে এনে দাওনি। এখন তোমার নিকট আমাদের বক্তব্য হল ঃ 'তোমার এই সব কাজের মূলে যদি ধন-সম্পদ সঞ্চিত করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে বল,

আমরা তোমার জন্য বিপুল ধন-সম্পদ স্তূপীকৃত করে দেব; ফলে তুমি আমাদের সকলের তুলনায় অধিকতর ধনী ও বিত্তশালী ব্যক্তি হতে পারবে। তুমি যদি সম্মান ও মান-মর্যাদা লাভ করবার ইচ্ছা করে থাক, তাহলে বল, আমরাই তোমাকে আমাদের নেতা ও সরদার বানিয়ে নেব। তুমি যদি রাজা-বাদশা হওয়ার জন্য এই সব শুরু করে দিয়ে থাক, তাহলে তোমাকেই আমরা আমাদের বাদশাহ বানিয়ে নেব। আর যদি তোমার ওপর কোন জ্বিন সওয়ার হয়ে থাকে—এরকম প্রায়ই হয়—তাহলে তোমার চিকিৎসার জন্য আমরা যত অর্থ দরকার তা খরচ করব এবং তোমাকে জ্বিনমুক্ত করে ছাড়ব।

রাসূলে করীম (স) সম্পূর্ণ নীরব ও নির্বাক থেকে স্বার্থান্ধ ও ভীত-শংকিত কুরাইশ নেতাদের এই সব অর্থহীন বাচালতাপূর্ণ কতাবার্তা শুনলেন। তাদের চিন্তাধারা যে কতটা হীন ও নীচ, তা তিনি সহজেই বুঝে নিয়েছিলেন। তাই তাদের কথা শেষ হওয়ার পর তিনি ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন ঃ

তোমরা যে সব কথা বললে, তার কোন একটির সাথেও আমার একবিন্দু সম্পর্ক নেই। আমি যা কিছু তোমাদের সামনে পেশ করছি, তার মূলে ধন-সম্পদ বা মান-মর্যাদা লাভ লক্ষ্য নয়—নয় রাজত্ব আর বাদশাহী লাভ। আসল কথা হল, মহান আল্লাহ আমাকে তোমাদের প্রতি রাসূল করে পাঠিয়েছেন; আমার প্রতি তাঁর কালাম নাযিল হয়েছে। আমাকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন তোমাদের পরিণাম-পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেই। ভাল পরিণতি সম্পর্কে তোমাদের সুসংবাদ শুনাই এবং মন্দ পরিণাম সম্পর্কে তোমাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলি। আমি যেন আমার আল্লাহ্র বাণী তোমাদের নিকট পৌছিয়ে দেই। আমি যেন তোমাদেরকে নসীহত করি, প্রকৃত কল্যাণ লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করে তুলি। আমার এই সাবধান বাণী যদি তোমরা কবুল কর, তাহলে তার সুফল এই দুনিয়ায়ও তোমরা লাভ করবে আর পরকালীন কল্যাণ লাভও কেবলমাত্র এভাবেই সম্ভব। আর তোমরা যদি তা প্রত্যাখ্যান কর, তাহলে আমি ধৈর্য ধারণ করে থাকব এবং আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ নিজেই কোন ফায়সালা করে দেবেন—আমি তার প্রতীক্ষায় থাকব।

উপস্থিত লোকেরা এ সব কথা শুনে স্পষ্টত বুঝতে পারল, এ এক অবিচল ব্যক্তিত্ব। অনুনয় বা প্রলোভন দিয়ে তাঁকে তাঁর কাজ থেকে বিরত রাখা যাবে না। তাই তারা কথার ধরন পরিবর্তন করে তোষামুদি ভঙ্গিতে বলতে শুরু করল ঃ

আমাদের কোন একটা কথাও যদি তুমি গ্রহণ না কর, তাহলে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। তুমি তো ভাল করেই জান, আমরা কত কষ্ট-ক্লেশ, অভাব-অনটন ও দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে দিন গুজরান করছি। তোমার আল্লাহ্র—যিনি তোমাকে পাঠিয়েছেন—নিকট আমাদের ওপর থেকে দুঃখ-দৈন্যের এই জগদ্দল পাহাড়কে সরিয়ে নেয়ার জন্য প্রার্থনা কর। সম্মুখের এই পাহাড়টি আমাদের শহরটিকে সংকীর্ণ

করে রেখেছে। দো'আ কর, তোমার আল্লাহ্ যেন এটিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে আমাদের নগরটিকে অধিকতর প্রশস্ত করে দেন। এখানে পানির অভাব আমাদের জীবনকে সংকটাপন্ন করে দিয়েছে। তুমি প্রার্থনা কর, আল্লাহ্ যেন আমাদের জন্য পানির অফুরন্ত ধারা প্রবাহিত করেন। আর আমাদের যেসব মহান পূর্ব-পুরুষ অতীত হয়ে গেছেন, দো'আ কর, তোমার আল্লাহ্ যেন তাদেরকে এই দুনিয়ায় পুনরুজ্জীবিত করে পাঠান! কুচাই ইবনে কিলাব এদের মধ্যে প্রধান। তিনি ছিলেন আমাদের বংশে সর্বাধিক সত্যবাদী পুরুষ। তিনি আমাদের নিকট ফিরে এলে আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করব, তুমি যা কিছু বলছ, তা সত্য না মিথ্যা? তিনি যদি তোমার সত্যতা স্বীকার করেন এবং আমাদের কথামত তুমি যদি কাজ কর, তাহলে আমরা তোমাকে সত্য বলে মেনে নেব এবং বুঝতে পারব যে, আল্লাহ্র নিকট সত্যিই তোমার উচ্চ মর্যাদা রয়েছে ও তিনিই তোমাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন—যেমন তুমি দাবি করছ।

রাসূলে করীম (স) এ কথার জবাবে বললেন ঃ তোমাদের ধারণা ভুল। তোমরা যা কিছু বলছ, আমি সেই সব কাজের দায়িত্ব বা কর্তৃত্বসহ প্রেরিত হইনি। যে জন্য আমাকে রাসূলরূপে নিয়োজিত করা হয়েছে, তার কথা তোমাদেরকে বিস্তারিতভাবে বলেছি। আমি তো তোমাদের নিকট সে কথাই পেশ করেছি, আল্লাহ্ যে জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। এখন তা গ্রহণ করা বা না-করা তোমাদের ব্যাপার। যদি গ্রহণ কর, তা হলে ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই তোমরা সফল হতে পারবে। আর যদি প্রত্যাখ্যান কর, তাহলে আল্লাহ্র চূড়ান্ত ফায়সালা পর্যন্ত আমি ধৈর্য ধারণ করে অপেক্ষা করতে থাকব।

লোকেরা বলল ঃ তুমি যদি আমাদের বিষয়ে কিছু করতে না পার, তাহলে অন্তত নিজের জন্য এতটা ব্যবস্থা করে নাও যে, আল্লাহ্ তোমার সাথে একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে দেবেন, সে তোমার সত্যতার সাক্ষ্যদান করবে। তুমি আল্লাহ্র নিকট এই দো'আও কর যে, তিনি তোমার জন্য বিপুল ধন-সম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্যের খনি আর সুউচ্চ হর্ম্যরাজি বানিয়ে দেবেন। ফলে তুমি যা চাও তা সহজেই পেয়ে যাবে। কেননা এখন তো তুমি আমাদের মতই একজন সাধারণ মানুষ। আমরা যেমন হাটে-বাজারে চলাফেরা করি, তুমিও তা-ই কর; আমরা যেভাবে জীবিকা উপার্জন করি, তুমিও সেভাবে করতে বাধ্য হচ্ছ। আমরা এই মাত্র যে প্রস্তাব দিলাম, তা যদি বাস্তবায়িত হয়, তাহলেই না বুঝতে পারব, তুমি আমাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ এবং তোমার আল্লাহ্র নিকট তোমার একটা মান-সম্মান আছে। আর তুমি সত্যিই আল্লাহ্র রাসূল যেমন তুমি মনে করছ।

এ কথার জবাবে রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ না; আমি এর একটা কাজও করতে প্রস্তুত নই। আল্লাহ্র নিকট আমি আমার নিজের জন্য এসব চাইতে পারব না আর আমাকে এজন্য পাঠানোও হয়নি।

লোকেরা বলল ঃ তাহলে একটা কাজ কর। তুমি আকাশ ভেঙে তার টুকরাগুলো

আমাদের উপর ফেলে দাও। তাহলেই বুঝতে পারব, তুমি আল্লাহ্‌র রাসূল। এটাও না করলে আমরা তোমার প্রতি কি করে ঈমান আনতে পারি?

জবাবে রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ এ কাজ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। তিনি চাইলে করবেন, না চাইলে না করবেন।

কুরাইশ গোত্রের লোকেরা বলল ঃ তুমি তো আমাদের কোন কথাই মানছ না। শেষ কথা বলছি, তুমি একটা মস্তবড় সিঁড়ি তৈরী কর। তাতে করে তুমি আকাশে উঠে যাও। তারপরে চারজন ফেরেশতা সঙ্গে নিয়ে সেই সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আস। আমরা স্বচক্ষে চেয়ে চেয়ে তা দেখব। এ যদি তুমি করতে পার, তাহলে সম্ভবত আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনতে পারি।

এই বলে তারা চলে গেল। রাসূলে করীম (স) কুরাইশদের কথাবার্তা শুনে, তাদের চিন্তার মান ও ভাব-গতি দেখে খুবই হতাশ হয়ে পড়লেন। তিনি দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে ঘরে ফিরে এলেন। কেননা তিনি বড্ড আশাবাদী হয়েছিলেন এজন্য যে, কুরাইশরা ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করবে। তার পরিবর্তে তিনি দেখতে পেলেন তাঁর মূল দাওয়াতকে এড়িয়ে আজেবাজে কথার মধ্যে তাঁকে জড়িয়ে ফেলবার ও আসল কাজ থেকে বিরত রাখবার জন্য তাদের প্রাণান্ত চেষ্টা ও চাতুর্য।

এরপর রাসূলে করীম (স)-কে জব্দ করার জন্য কুরাইশরা অন্য ফন্দি আঁটল। তিনি নামাযে সিজদারত থাকা অবস্থায় আবু জেহেল একটি উটের নাড়ি-ভূড়ি এনে তাঁর মাথার ওপর ফেলে দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করল। এই মতলবে একদিন সে চেষ্টাও চালাল। কিন্তু তাঁর দিকে অগ্রসর হতে গিয়েই একটি ভয়ংকর দৃশ্য দেখে সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ হে আবুল হেকাম, তোমার কি হল? বলল, আমার সেই বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হতেই দেখি একটি ভয়ঙ্কর জন্তু আমাকে তাড়া করে আসছে। ওর মত শানিত দাঁত আর সিং আমি জীবনে কখনই দেখিনি। আমার ভয় হল—জন্তুটি আমাকে খেয়ে ফেলবে হয়ত। তাই আর অগ্রসর হতে পারলাম না।

পরে রাসূলে করীম (স) সব টের পেয়ে গেলেন এবং আবু জেহেল যে তার কুমতলবে সফল হতে পারে নি, তাও বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন, এটা জিবরাইল ফেরেশতারই কাজ। তিনিই এই জন্তুর রূপ ধারণ করে আবু জেহেলকে তাড়া করেছেন।

এই কাহিনী থেকে স্পষ্টত বুঝতে পারা যায়, শ্রেষ্ঠ নবী ও মানব জাতির শ্রেষ্ঠ নেতা দ্বীনের দাওয়াত পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে জাহিলী সমাজ থেকে এক কঠিন প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিলেন। প্রথম পর্যায়ে তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও লাঞ্ছনা-অবমাননার প্রচণ্ড আঘাতে জর্জরিত করতে চেষ্টা করা হয়েছে। অতপর তাঁর বিরুদ্ধে নানারূপ মিথ্যা দোষারোপ ও ভিত্তিহীন অপপ্রচার প্রবলভাবে চালানো হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে অমানুষিক শত্রুতার সাথে মুকাবিলা করতে হয়েছে। আর এ ব্যাপারে সর্বাধিক অগ্রবর্তী

ছিল আবু জেহেল ও আবু লাহাবের ন্যায় একান্ত আপনজন। আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁকে নির্দেশ দিলেন, হে নবী! তুমি তোমার অতি আপন ও অতি নিকটবর্তী লোকদেরকে পরকালীন সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দাও, তখনই তিনি প্রকাশ্যভাবে দ্বীনের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। তিনি মক্কার সাফা পর্বতের ওপরে দাঁড়িয়ে এক একটি গোত্রের নাম ধরে ডেকে সবাইকে একত্রিত করলেন এবং সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন ঃ

> আমি যদি বলি, এই পর্বতের অপর পার্শ্বে এক বিরাট শত্রুবাহিনী সুসজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; তারা পর্বত অতিক্রম করে তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে ও তোমাদের ধ্বংস ও নির্মূল করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তাহলে তোমরা কি সে কথা বিশ্বাস করবে?

সমবেত জনতা সমস্বরে বলে উঠল ঃ নিশ্চয়ই এবং নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করব। কেননা তুমি তো সত্যবাদী ব্যক্তি; কোনদিন মিথ্যা বলেছ বলে আমাদের জানা নেই। তখন তিনি বললেন ঃ 'তোমরা জেনে রাখ, মৃত্যুর পর পরকালে তোমাদের জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব প্রস্তুত হয়ে রয়েছে যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান না আন, তাঁর বন্দেগী ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য স্বীকার না কর।'

আবু লাহাব বলে উঠল ঃ তোমার ধ্বংস হোক, তুমি এ জন্যই কি আমাদের ডেকেছিলে? অতপর কুরআন মজীদের একটি সূরা নাযিল হয়। তাতে বলা হয় ঃ আবু লাহাব ধ্বংস হোক, তার ধন-মাল ও উপার্জিত সম্পদ তাকে কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে না। সে নিশ্চয়ই লেলিহান শিখাবিশিষ্ট আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে—তার স্ত্রীও, যে কাষ্ঠ সংগ্রহ ও বহনকারী। তার গলায় একটি শক্ত পাকানো রশি পেচানো।'

নবী করীম (স) এ সময়ে যে দাওয়াত দিতেন, এক কথায় তা হল ঃ হে মানুষ! তোমরা সকলে বল ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্—তাহলেই তোমরা সার্বিক কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হবে।

একদা তিনি একটি বাজারে ঢুকে লোকদেরকে এই দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন আর তার পিছনে পিছনে তাঁরই আপন চাচা আবু লাহাব বলে যাচ্ছিল ঃ তোমরা এর কথা আদৌ বিশ্বাস করবে না। তার স্ত্রী আরওয়া রাসূলে করীম (স)-এর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত; তাঁর দারিদ্রকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। সে মুঠোর মধ্যে পাথরখণ্ড নিয়ে চলত, যেন রাসূলে করীম (স)-কে সম্মুখে দেখতে পেলেই তাঁকে লক্ষ্য করে তা নিক্ষেপ করতে পারে। একবার সে এই উদ্দেশ্যে কা'বার নিকটে উপস্থিত হল। সেখানে রাসূলে করীম (স) ও হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) বসেছিলেন। আরওয়া রাসূলে করীম (স)-কে দেখতে না পেয়ে গালাগাল করে ফিরে যেতে বাধ্য হল।

রাসূলে করীম (স) তায়েফের সকীফ গোত্রের লোকদেরকে আল্লাহ্র বন্দেগী কবুল করার দাওয়াত দেবার উদ্দেশ্যে তথায় গমন করলেন। কিন্তু তারা তাঁর দাওয়াত কবুল

করল না—শুধু তা-ই নয়, তারা নানাভাবে তাঁকে কষ্ট ও পীড়া দিতেও কুণ্ঠিত হল না। প্রথমে খুবই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাঁকে অপমান করল। পরে গুণ্ডা-পাণ্ডাদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে তাঁর ওপর পাথর বর্ষণ করাল। রাসূলে করীম (স) মক্কা থেকে বন্ধুর পর্বতময় পথ অতিক্রম করে তাদের নিকট গেলেন তাদেরকে একমাত্র কল্যাণ পথের সন্ধান দেবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তারা প্রস্তরাঘাতে তাঁকে ক্ষত-বিক্ষত করে তাড়িয়ে দিল। তাঁর দেহ মুবারক থেকে অজস্র ধারায় রক্ত প্রবাহিত হয়ে তাঁর জুতাকে সিক্ত করে দিল। তিনি অবসন্ন দেহে পথিপার্শ্বে লুটিয়ে পড়লেন। পর্বতের ফেরেশতা এসে বললেন ঃ আপনি বললে এক্ষুনি চতুষ্পার্শের পর্বতগুলিকে ধরাশায়ী করে গোটা গোত্রের লোকদেরকে নিষ্পেষিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারি। কিন্তু নবী করীম (স) বললেন ঃ তা হয় না, এদের দ্বীন কবুলের ব্যাপারে আমি এখনও নিরাশ হইনি। এদের বংশধর থেকেই তো মুসলিম উম্মত গড়ে উঠবে।

কতটা দৃঢ়চেতা, বলিষ্ঠ মন-মানসিকতা, আল্লাহ্‌র ওপর অবিচল নির্ভরতা, মানুষের প্রতি ঐকান্তিক দরদ, ভালবাসা ও কল্যাণ কামনা এবং আদর্শবাদিতা ও দায়িত্বজ্ঞানসহ হযরত মুহাম্মাদ (স) দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তা এ সব ছোটখাট ঘটনা থেকে সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে উঠে। বস্তুত এ ছাড়া যে দুনিয়ার বুকে কোন আদর্শই কখনো বাস্তবায়িত হতে পারে না, তা না বললেও চলে। যেসব লোক রাসূলে করীম (স)-এর এই দ্বীনি দাওয়াত কবুল করেনি, বরং প্রত্যাখ্যান করেছে, তাঁর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছে, অস্ত্র ধারণ করেছে, এমন কি তাঁর পবিত্র জীবনকে সংহার করতে চেয়েছে, তিনি তাদেরও ক্ষমা করেছেন। তাদের ধ্বংস বা কোনরূপ অমঙ্গল তিনি চান নি কখনই।

বস্তুত রাসূল (স) যদি ধন-সম্পদের অভিলাষী হতেন, তাহলে তিনি তা সহজেই লাভ করতে পারতেন—হতে পারতেন সমগ্র কুরাইশ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তি। শুধু রাজা-বাদশাহ হওয়াই যদি তাঁর জীবনের লক্ষ্য হত, মান-মর্যাদার কাঙাল হতেন তিনি, তবে সমগ্র আরব তাঁকে অবলীলাক্রমে নিজেদের বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন নেতা রূপে বরণ করত; তাঁকে বানিয়ে নিত নিজেদের রাজা ও একচ্ছত্র বাদশাহ। তাঁর শিরোদেশে বসিয়ে দিত লক্ষমুদ্রা মূল্যের রত্নখচিত রাজমুকুট। তিনি যদি সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী রমনীর স্বামী হবার বাসনা করতেন, তাহলে কুরাইশরা তাঁকে সেরা সুন্দরী স্ত্রী জুটিয়ে দিত। কিন্তু না, তিনি এ ধরনের হীন ও তুচ্ছ উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় প্রেরিত হন নি। তিনি এসেছিলেন তাঁর ওপর অর্পিত নবুয়্যাত ও রিসালাতের মহান দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে। এ জন্য তিনি প্রতিপক্ষের সকল প্রকার জ্বালা-যন্ত্রণা ও জুলুম-অত্যাচার সহ্য করতে—দৈহিকভাবে ক্ষত-বিক্ষত হতে এবং শেষ পর্যন্ত প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। এটা কোন ভিত্তিহীন উচ্ছ্বাসমূলক স্তুতি নয়, ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহে অনস্বীকার্য বাস্তব। তাঁর চাচা আবু তালিব স্ববংশীয় লোকদের আক্রমণ ও আঘাত থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্য নিজের বুক পেতে দিয়েছিলেন। কুরাইশ বংশের এই নেতৃস্থানীয় সম্মানিত

ব্যক্তিকেও তারা নানাভাবে নাজেহাল করতে ছাড়েনি। তারা একবার দলবদ্ধ হয়ে তাঁর কাছে এসে চাপ প্রয়োগ করল। বলল ঃ আপনি আপনার এই ভাতিজাকে বিরত রাখুন অথবা তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা থেকে আপনি নিজে বিরত হোন কিংবা তাঁকে আমাদের হাতে সোপর্দ করে দিন, আমরাই তাঁকে ঠিক করে নেব। এ সময় আবু তালিব নবী করীম (স)-কে বললেন ঃ হে ভাতিজা! লোকেরা আমাকে তোমার সম্পর্কে এই সব বলছে। তুমি আমার ওপর এতটা বোঝা চাপিয়ে দিও না, যা বহন করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। রাসূল (স) জবাবে বলেছিলেন, আমি যা কিছু করছি তা একমাত্র আল্লাহ্র জন্য আল্লাহ্র নির্দেশমত এবং তাঁরই ওপর ভরসা করে করছি। আপনি যদি এ বোঝা বহন করতে না-ই পারেন, তাহলে আপনি আমার কোন দায়িত্বই নেবেন না। একবার এই কুরাইশরা নানা কথা বলে তাঁকে বিরত রাখবার জন্য প্রত্যক্ষভাবে কথা বলল। জবাবে তিনি বললেন ঃ

> ওরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চন্দ্র তুলে দিয়ে এর বিনিময়ে আমাকে কর্তব্য থেকে বিরত রাখতে চায়, তবুও আমি বিরত থাকব না যতক্ষণ না আল্লাহ্ চূড়ান্তভাবে মহাসত্যকে সমুজ্জ্বল করে তুলবেন কিংবা আমি নিজেই ধ্বংস হয়ে যাব।

কি যুদ্ধ কি শান্তি—কোন অবস্থায়ই রাসূলে করীম (স) তাঁর মহান দায়িত্ব পালন থেকে বিন্দু পরিমাণ বিরতি বা বিচ্যুতি মেনে নেন নি। তিনি ছিলেন অপরিসীম ধৈর্যশীল মুজাহিদ—একমাত্র আল্লাহ্র ওপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল। সুখে-দুখে তাঁর নির্ভরতা (তাওয়াক্কুল) ছিল একমাত্র আল্লাহ্র ওপর। ওহুদের যুদ্ধে এক সময় মুসলিম বাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। তখন তড়িৎ গতিতে এই সংবাদ চতুর্দিকে প্রচার হয়ে পড়ে যে, রাসূলে করীম (স) নিহত হয়েছেন। তখন অবস্থা ছিল এই যে, মুষ্টিমের লোক তাঁকে পরিবেষ্টিত রেখে মুশরিকদের সাথে অবিরাম অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। হযরত আবু দাজানা রাসূলের দেহ মুবারককে নিক্ষিপ্ত তীরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে নিজের বুক পেতে দাঁড়িয়েছিলেন। হযরত সা'আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) রাসূলের দিক থেকে প্রতিপক্ষের ওপর তীর নিক্ষেপ করছিলেন। এ সময় বহু সংখ্যক সাহাবী শাহাদত বরণ করেন। শাহাদাতের পূর্বে তাঁরা এ কথাও জেনে যেতে পারেন নি যে, রাসূলে করীম (স) জীবিত রয়েছেন। এই সময় শত্রু পক্ষের বল্লমের আঘাতে রাসূলে করীম (স)-এর দাঁত চূর্ণ হয়ে যায় এবং মুখমণ্ডল আহত হয়। তাঁর ওষ্ঠ কেটে যায়। কপোলের ভিতর দুটি বর্মচূর্ণ শলাকা প্রবিষ্ট হয়ে পড়ে। সহসা চলতে গিয়ে কাফিরদের তৈরী একটি কূপের মধ্যে তিনি পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে হযরত আলী (রা) তাঁর হাত ধরে ফেললেন এবং হযরত তাল্হা তাঁকে ওপরে তুলে নিলেন। দেখা গেল রাসূলে করীম (স)-এর মুখমণ্ডল থেকে অজস্র ধারায় রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। হযরত আবু উবায়দা (রা) নিজের দাঁত দিয়ে কামড়ে একটি শলাকা তুলে ফেলেন। ফলে তাঁরও একটি দাঁত ভেঙে যায়। অতপর অপর শলাকাটি তুলতে গিয়ে তিনি আরও একটি দাঁত হারিয়ে ফেলেন। এ সময় রাসূলে করীম (স) হাত দিয়ে মুখের ওপর থেকে প্রবহমান রক্তধারা মুছে নিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন ঃ

যে জাতি তাদের কল্যাণে প্রেরিত ও নিবেদিত নবীকে আহত করে, সে জাতি কি করে কল্যাণ পেতে পারে! অথচ নবীর অপরাধ শুধু এইটুকু যে, তিনি তাদের আহ্বান করছেন আল্লাহ্র বন্দেগী কবুল করার জন্য।

ওহুদের যুদ্ধে আমরা যেখানে দেখতে পাই রাসূলে করীম (স)-এর অনন্যসাধারণ ধৈর্য সহ্য ও সর্বজয়ী বীরত্ব এবং অপরিসীম সাহসিকতার সুস্পষ্ট নিদর্শন, সেখানে হুনাইনের যুদ্ধে তাঁর মধ্যে দেখতে পাই প্রত্যয় ও বিশ্বাসের অপূর্ব শক্তি ও বীর্যবত্তা—আল্লাহ্র ওপর অকৃত্রিম নির্ভরতা। তাতে এই বিশ্বাস প্রবল হয়ে উঠে সকলের মনে যে, তিনি ছিলেন আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ রাসূল, সর্বশেষ নবী (খাতামুন্নাবীয়্যীন) এবং সেরা সৃষ্টি।

হুনাইনের যুদ্ধে মুসলমানরা সৈন্য-শক্তিতে ছিল বিপুল। একজন সৈনিক তো উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন ঃ এবারে আমরা বারো হাজার সৈন্য নিয়ে এসেছি। এবারে আমরা পরাজিত হচ্ছি না। কিন্তু আল্লাহ্র কি মর্জী! মুসলমানরা এই জনশক্তির জোরে বিজয়ী হতে পারলেন না। অবশ্য আল্লাহ্র বিশেষ মদদ এসে তাদের অনেকখানি ধন্য করেছিল। রাসূলে করীম (স) মুষ্টিমেয় সাহাবী পরিবেষ্টিত হয়ে উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করছিলেন ঃ 'আমি আল্লাহ্র নবী। একবিন্দু মিথ্যা নয় এ কথা। আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর'। অথচ বহু সংখ্যক মুসলমান শত্রুর আক্রমণের সম্মুখে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এই সময়ও রাসূলে করীম (স) অবিচলভাবে তাঁর জন্তুযানে সওয়ার হয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধের মাঝে ময়দানে দাঁড়িয়েছিলেন। একটি লোক হযরত বারাআ ইবনে আজেব (রা)-কে—যিনি এই যুদ্ধে শরীক ছিলেন—জিজ্ঞাসা করেছিল ঃ হুনাইনের যুদ্ধে শত্রুপক্ষের সর্বাত্মক আক্রমণের মুখে আপনারা মুসলমানরা কি পালিয়ে গিয়েছিলেন? জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ আমাদের অবস্থা প্রায় তা-ই হয়েছিল। কিন্তু রাসূলে করীম (স) একবিন্দু পরিমাণও বিচলিত হন নি—হটে যান নি। শত্রুপক্ষ ছিল সুদক্ষ তীর নিক্ষেপকারী। আমরা যখন তাদের সম্মুখবর্তী হয়ে পড়েছিলাম, তারা আমাদের ওপর তীক্ষ্ণ শানিত তীরসমূহ বৃষ্টির মত বর্ষণ করতে শুরু করে দিয়েছিল। ফলে আমরা অনেকখানি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি। কিছু সংখ্যক মুসলমান গনীমতের মাল-সম্পদ সংগ্রহ করতে থাকলে তাদের ওপর বল্লমের আক্রমণ করা হয়। এ সময়ও মুসলিম বাহিনী কঠিনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এহেন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও নবী করীম (স) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সবকিছুর মুকাবিলা করে যাচ্ছিলেন এবং বিপর্যস্ত ও ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত মুসলমান সৈন্যদের ডেকে ডেকে একত্রিত করছিলেন।

এ ঘটনাও অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, সাধারণ মানুষের হৃদয় যখন কেঁপে ওঠে, মন দমে যায়—মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চিন্তায় দিশেহারা হয়ে যায়, সেহেন কঠিন অবস্থায়ও রাসূলে করীম (স) দৃঢ়চিত্ত ও অবিচল হয়েই তাঁর দায়িত্ব পালনে নিরত রয়েছেন।

এক কথায় বলা যায়, হযরত মুহাম্মাদ (স) ছিলেন একজন অতুলনীয় সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব। আর তাঁর এই সংগ্রাম একান্তভাবে নিবেদিত ছিল তাঁর আদর্শের জন্য; দুনিয়ার বুকে আল্লাহ্র দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। এ আদর্শবাদই তাঁকে এতখানি সংগ্রামী ও দুঃসাহসী হতে সহায়তা করেছে।

বিপ্লবের পয়গাম

মারহাবা সাইয়্যেদে মক্কী মাদানী-আল-আরাবী!
তুমিই আমাদের নেতা, আমাদের পথ-প্রদর্শক!
মুহাম্মাদ নামটি কতই না সুন্দর, কতই না মিষ্টি,
প্রত্যহ পাঁচ বার নামাযের আযানে
এই নামটি হয় ধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত।

এটি শুধু একটি মানুষের নাম নয়,
এটি এক পূর্ণাঙ্গ দ্বীনী দাওয়াত, একটি বিপ্লবী আন্দোলন।
মুসলিম জাহানের দিকে দিকে, কোণে কোণে
ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে
এই নাম উচ্চারণকারী অসংখ্য লোক।

সকলের মাঝে ঐক্যের একমাত্র সূত্র এই নাম।
কালেমা বিশ্বাসী মুসলিম সর্বত্র ছড়িয়ে আছে,
তাদের বর্ণ-ভাষা-বংশ ও অঞ্চল বিভিন্ন
কিন্তু এই একটি নাম তাদের সকলের নিকট সর্বাধিক শ্রদ্ধেয়,
সর্বাধিক সম্মানিত।

এই নামটিই তাদের সকলের মিলন-বিন্দু।
এই নামই 'আল্লাহ্‌র রজ্জু'—সন্দেহাতীত।
ইতিহাস সাক্ষী—যতদিন আমরা পূর্ণ চেতনা ও
আন্তরিকতা সহকারে উচ্চারণ করেছি এই নাম
কবুল করেছি তাঁর দাওয়াত,
ততদিন বিশ্ব নেতৃত্ব রয়েছে আমাদেরই মুঠোয়।

আর যখনি আমরা ত্যাগ করেছি মুহাম্মাদের আনুগত্য,
আমরা হয়ে গেছি নানাভাবে বিভক্ত।
চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে আমাদের জাতিসত্তা,
আমরা হয়ে গেছি পথের ধূলিকণা,

বিশ্ব-বিজয়ীরা আমাদের বুকের ওপর দিয়ে
সদম্ভে চলে গেছে সমুখের পানে।

'মুহাম্মাদ' একটি নাম—একটি শক্তি,
ইতিহাসের এক অনন্য বিপ্লবী নায়ক।
তাঁর নামই মুসলিমকে দিয়েছে শক্তি
আর এই শক্তিই মুসলিম মিল্লাতকে দিয়েছে
এক তুলনাহীন বৈশিষ্ট্য—বিশেষত্ব।
আমরা গড়েছি সুসংবদ্ধ সমাজ-রাষ্ট্র-সভ্যতা,
সে সভ্যতা আজও ভাস্বর, আজও অতুলনীয়।

'মুহাম্মাদ' একটা জ্বলজ্বল করা শিরোনাম,
তিনি আল্লাহ্র রাসূল, সর্বশেষ নবী,
সভ্যতা সংস্কৃতি, জ্ঞান, চিন্তা মতাদর্শের প্রবর্তক,
বিশ্বমানবের উদ্দেশে তিনি জানিয়েছেন
কল্যাণ-পথে চলার আকুল আহ্বান
সে আহ্বান অগ্রাহ্য করবে কে?

'মুহাম্মাদ' একটি আলোড়ন, একটি বিপুল সাড়া,
এই পবিত্র নামের উচ্চারণে অনুভূত হয় তুলনাহীন মিষ্টতা।
কোনদিনই বিতৃষ্ণা জাগবে না এ নামের পৌনপুনিক ঘোষণায়।
মনে হবে—সর্ব মিষ্টতাই যেন এর মধ্যে একীভূত।

'মুহাম্মাদ' জীবনের জন্য এক নির্ভুল দিশারী।
আল্লাহ্র সমুখে মাথা নত করা,
শ্রদ্ধা-ভক্তিতে মস্তক ধূলায় লুটিয়ে দেয়া খুবই সহজ।
কিন্তু 'মুহাম্মাদ' চান মানুষের সার্বিক সত্তা,
খোদার বন্দেগীর জন্য, রাসূলের আনুগত্যের জন্য
সমগ্র জীবনব্যাপী—সকল কর্মে ও সাধনায়।
এ আহ্বান চিরন্তন—শাশ্বত।

আমরা সেই 'মুহাম্মাদ'কে নিয়ে জনতার সমুখে হাযির।
জীবনের সব দিকে, সব কাজে তাঁর দেয়া আদর্শই আমাদের পরম দিশারী।

আমরা চলব তাঁরই দেখানো পথে
একা নয়, সকলকে নিয়ে, সব কিছু ছিনিয়ে।
রাসূলের সুন্নাত সেই পথকে করেছে উজ্জ্বল—উদ্ভাসিত।

আল্লাহ্‌র বিধান জেনেছি তাঁর কাছ থেকে
আল্লাহ্‌র বিধান পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে
আল্লাহ্ কিসে খুশী, কিসে অখুশী,
তা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি
তাই আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য;

তাঁর নামের দৌলতে নির্মূল করব আমরা
জাহিলিয়াতের সব প্রতিষ্ঠা, সব নাম-নিশানা
আমরা হব তাঁর অনুসারী উম্মত।
তাঁর দেয়া আদর্শকেই আমরা বানাব
জীবনের আদর্শ, পথের নির্দেশনা।

আদর্শের ক্ষেত্রে তা-ই হবে অনন্য।
তন্ত্র-মন্ত্র নামের আর যত ভেল্কীবাজি
সব হয়ে যাবে নিঃশেষ।
উদাত্ত কণ্ঠে আমরা আবার ঘোষণা করব ঃ
“সত্য এসে পড়েছে, মিথ্যা হয়েছে অপসৃত।”

গ্রন্থকার পরিচিতি

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) বর্তমান শতকের এক অনন্যসাধারণ ইসলামী প্রতিভা। এ শতকে যে ক'জন খ্যাতনামা মনীষী ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা কায়েমের জিহাদে নেতৃত্ব দানের পাশাপাশি লেখনীর সাহায্যে ইসলামকে একটি কালজয়ী জীবন-দর্শন রূপে তুলে ধরতে পেরেছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম।

এই ক্ষণজন্মা পুরুষ ১৩২৫ সনের ৬ মাঘ (১৯১৮ সালের ১৯ জানুয়ারী) সোমবার, বর্তমান পিরোজপুর জিলার কাউখালী থানার অন্তর্গত শিয়ালকাঠি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি শর্ষীনা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আলিম এবং ১৯৪০ ও ১৯৪২ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে যথাক্রমে ফাযিল ও কামিল ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণায় নিরত থাকেন। ১৯৪৬ সালে তিনি এ ভূখণ্ডে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেন এবং সুদীর্ঘ চার দশক ধরে নিরলসভাবে এর নেতৃত্ব দেন।

বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) শুধু পথিকৃতই ছিলেন না, ইসলামী জীবন দর্শনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ৬০টিরও বেশি অতুলনীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'কালেমা তাইয়েবা', 'ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা', 'মহাসত্যের সন্ধানে', 'বিজ্ঞান ও জীবন বিধান', 'বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব', 'আজকের চিন্তাধারা', 'পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি', 'সুন্নাত ও বিদয়াত', 'ইসলামের অর্থনীতি', 'ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন', 'সুদমুক্ত অর্থনীতি', 'ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা', 'কমিউনিজম ও ইসলাম', 'নারী', 'পরিবার ও পারিবারিক জীবন', 'আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ', 'আল-কুরআনের আলোকে শিরক ও তওহীদ', 'আল-কুরআনের আলোকে নবুয়্যাত ও রিসালাত', 'আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার', 'ইসলাম ও মানবাধিকার', 'ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা', 'রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী দাওয়াত', 'ইসলামী শরীয়াতের উৎস', 'অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম', 'অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে ইসলাম', 'শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি', 'ইসলামে জিহাদ', 'হাদীস শরীফ (তিন খণ্ড)' ইত্যাকার গ্রন্থ দেশের সুধীমহলে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছে। এছাড়া অপ্রকাশিত রয়েছে তাঁর অনেক মূল্যবান পাণ্ডুলিপি।

মৌলিক ও গবেষণামূলক রচনার পাশাপাশি বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী মনীষীদের রচনাবলি বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারেও তাঁর কোনো জুড়ি নেই। এসব অনুবাদের মধ্যে রয়েছে মওলানা মওদূদী (রহ)-এর বিখ্যাত তফসীর 'তাফহীমুল কুরআন', আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী-কৃত 'ইসলামের যাকাত বিধান (দুই খণ্ড)' ও 'ইসলামে হালাল হারামের বিধান', মুহাম্মদ কুতুবের 'বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত' এবং ইমাম আবু বকর আল-জাস্‌সাসের ঐতিহাসিক তফসীর 'আহকামুল কুরআন'। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যাও ৬০টিরও ঊর্ধ্বে।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-র অন্তর্গত ফিকাহ্ একাডেমীর একমাত্র সদস্য ছিলেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সূচিত 'আল-কুরআনে অর্থনীতি' এবং 'ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস' শীর্ষক দুটি গবেষণা প্রকল্পেরও সদস্য ছিলেন। প্রথমোক্ত প্রকল্পের অধীনে প্রকাশিত দুটি গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ তাঁরই রচিত। শেষোক্ত প্রকল্পের অধীনে তাঁর রচিত 'সৃষ্টিতত্ত্ব ও ইতিহাস দর্শন' নামক গ্রন্থটি এখনও প্রকাশের অপেক্ষায়।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) ১৯৭৭ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন ও রাবেতা আলমে ইসলামীর সম্মেলন, ১৯৭৮ সালে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইসলামী দাওয়াত সম্মেলন, একই বছর করাচীতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ইসলামী মহাসম্মেলন, ১৯৮০ সালে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত আন্তঃপার্লামেন্টারী সম্মেলন এবং ১৯৮২ সালে তেহরানে অনুষ্ঠিত ইসলামী বিপ্লবের তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

এই মনীষী ১৩৯৪ সনের ১৪ আশ্বিন (১৯৮৭ সালের ১ অক্টোবর) বৃহস্পতিবার এই নশ্বর দুনিয়া ছেড়ে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। (ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)